ইসলামের রুকনসমূহ

[Bengali – বাংলা – بنغالي]




ইলমী গবেষণা ডীনশীপ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
মদিনা মুনাওয়ারা



অনুবাদ: মোহাম্মাদ ইবরাহীম আবদুল হালীম
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

أركان الإسلام

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية



ترجمة: محمد إبراهيم عبد الحليم
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

প্রথম রুকন: “আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল” এ সাক্ষ্য দেওয়া

এ দু’ সাক্ষ্য ইসলামে প্রবেশ পথ ও তার মহান স্তম্ভ। কোনো ব্যক্তি মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে এ দু’ সাক্ষ্য মুখে উচ্চারণ করবে ও সাক্ষ্যদ্বয়ের দাবী অনুযায়ী আমল করবে।

আর এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই এক কাফির মুসলিম হয়ে যায়।

১- আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এ সাক্ষ্য দানের অর্থ: এর অর্থ জেনে তা মুখে উচ্চারণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করা।

বস্তুত এর অর্থ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করা সকলের ঐকমত্যে কোনো উপকারে আসে না। বরং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

আর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থ হলো: এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই।

এ কালেমার দু’টি রুকন (অঙ্গ) রয়েছে:

১- না-বাচক অঙ্গ; (অস্বীকৃতি জানানো আর ২- হ্যাঁ-বাচক অঙ্গ (স্বীকৃতি জানানো):

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করা এবং সে উপাসনা একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, যার কোনো অংশীদার নেই। তাগুতকে অস্বীকার করাও এ কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

তাগুত-হলো, আল্লাহ ছাড়া মানুষ, পাথর, বৃক্ষ ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি যা কিছুর পূজা-উপাসনা করা হয় আর সে উপাস্য তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

মূলতঃ তাগুতকে ঘৃণা করা ও তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করাও এ কালেমার অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, যে ব্যক্তি এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে অথচ আল্লাহ ছাড়া যে সকল বস্তুর ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করে নি সে এ কালেমার দাবী পূরণ করে নি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٣ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

"তোমাদের ইলাহ-উপাস্য হলেন এক ও অদ্বিতীয় আর সে মহান করুণাময় দয়ালু ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ- উপাস্য নেই।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦]

"দীনে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নাই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবূত হাতল ধরবে

যাহা কখনও ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬]

আর ইলাহ-এর অর্থ: মা‘বুদ-উপাস্য। কেউ যদি এ বিশ্বাস করে যে ইলাহ অর্থ সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা বা নতুন কিছু আবিস্কারে ক্ষমতাশীল, আর সে যদি মনে করে যে এ বিশ্বাসই যথেষ্ট, যদিও সে সকল ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট না করে- সে ব্যক্তির ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ দুনিয়াতে কোনো উপকারে আসবে না, আর আখিরাতে স্থায়ী শাস্তি হতে এ কালেমা তাকে মুক্তিও দিবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١﴾ [يونس : ٣١]

“বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবিতকে মৃত থেকে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত থেকে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٨٧﴾ [الزخرف: ٨٧]

“যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা

অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরছে?” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

২- কালেমায়ে তাওহীদ-এর শর্তসমূহ:

(১) ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থ জানা, যা না জানার বিপরীত।

নেতিবাচক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত না করা। আর ইতিবাচক হলো ইবাদাত এককভাবে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনিই একমাত্র ইবাদাতের মালিক ও হক্বদার।

(২) এ কালেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, যা যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ের বিপরীত।

অর্থাৎ এ কালেমার দাবীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আন্ত-রিকভাবে নিশ্চিত হয়ে মুখে উচ্চারণ করা।

(৩) এ কালেমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী।

অর্থাৎ এ কালেমার সকল দাবী-চাহিদা ও তার বক্তব্য গ্রহণ করা। সংবাদসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, আদেশসমূহ পালন করা। নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা। কুরআন ও হাদীসের দলীল পরিত্যাগ ও অপব্যাখ্যা না করা।

(৪) কালেমার প্রতি অনুগত হওয়া, যা ছেড়ে দেওয়ার পরিপন্থী। অর্থাৎ এ কালেমা যে সকল বিধানের নির্দেশ দিয়েছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তার প্রতি অনুগত থাকা।

(৫) এ কালেমাকে সত্য জানা, যা মিথ্যারোপ করার বিরোধী। আর তা

হলো বান্দা এ কালেমাকে সত্য জেনে অন্তর থেকে উচ্চারণ করবে। অর্থাৎ এ কালেমা পাঠকারীর অন্তর তার কথা মোতাবেক হবে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী হবে।

অতঃপর যে ব্যক্তি এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছে অথচ তার দাবীকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয় তার মুখের এ উচ্চারণ তার কোনো কাজে আসবে না। যেমন, মুনাফিকদের অবস্থা ছিল। তারা এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করতো কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করতো।

(৬) পূর্ণ একনিষ্ঠতা থাকা, যা শির্কের পরিপন্থী। আর তা হলো বান্দা তার আমলকে নেক নিয়াতের দ্বারা শির্কের সকল প্রকারের গ্লানি থেকে মুক্ত রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥﴾ [البينة: ٥]

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করার"। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

(৭) এ কালেমার সাথে মুহাব্বাত-ভালোবাসা রাখা, যা বিদ্বেষের পরিপন্থী।

আর তা বাস্তবায়িত হবে, এ কালেমাকে, তার দাবীকে, তার নির্দেশিত বিধানকে এবং যারা এ কালেমার শর্ত মোতাবেক চলে তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে। আর উল্লিখিত কথাগুলোর বিপরীত কথার সাথে বিদ্বেষ রাখার মাধ্যমে।

এর নিদর্শন হলো, আল্লাহর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তা

প্রবৃত্তি বিরোধী হয়। আর আল্লাহর যা অপছন্দ তা অপছন্দ করা, যদিও তার দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যাদের বন্ধুত্ব রয়েছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যাদের শত্রুতা রয়েছে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٤﴾ [الممتحنة : ٤]

“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন”। [সূরা আল-মুমতাহানাহ, আয়াত: ৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]

“তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা দৃঢ়তম”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫]

আর যে ব্যক্তি ইখলাস ও ইয়াকীনের সাথে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই” একথা বলবে এবং সকল পাপাচার, বিদ‘আত, ছোট শির্ক ও বড় শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট থেকে হিদায়াত পাবে। আর আখিরাতে শাস্তি থেকে নিরাপত্তা পাবে। তার ওপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।

এ শর্তগুলো পূর্ণ করা বান্দার ওপর আবশ্যক। আর এ শর্তগুলো পূর্ণ করা অর্থ হলো যে, এ শর্তগুলো একজন বান্দার জীবনে সমাবেশ ঘটা এবং তা জানা অত্যাবশ্যক হওয়া। তবে তা মুখস্থ করা জরুরী নয়।

এ মহান কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) হলো তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ বা ইবাদতে একত্বতা গ্রহণ, যা তাওহীদের প্রকারসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাওহীদ, এ বিষয়েই নবীগণ ও তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে মতানৈক্য সংঘটিত হয়েছিল। আর এরই বাস্তবায়নের জন্যে রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ

﴿عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٣٦﴾ [النحل: ٣٦]

“আর অবশ্যই আমরা আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্যই তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর নিকটে এ অহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা‘বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

আর যখন শুধু তাওহীদ বলা হবে, তখন তা থেকে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ-এর সংজ্ঞা: আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার মালিক, তিনি এককভাবে ইবাদাতের মালিক, তাঁর কোনো শরীক নেই এ স্বীকৃতি দেওয়া।

তাওহীদুল উলূহিয়্যার নামসমূহ: এ তাওহীদকে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা ইলাহিয়্যাহ বলা হয়। কারণ, একনিষ্ঠভাবে তা নিছক তা‘আল্লুহ (تألہ) ওপর প্রতিষ্ঠিত। একক আল্লাহর জন্য অধিক ভালোবাসাকে তা‘আল্লুহ বলা হয়।

নিম্নে বর্ণিত নামগুলো তাওহীদুল উলূহিয়্যার নাম:

(ক) তাওহীদুল ইবাদাহ বা উবূদিয়্যাহ: কারণ, তা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাত নির্ধারিত হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) তাওহীদুল ইরাদা: কারণ, তা আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) তাওহীদুল কাছদ: কারণ, তা এক আল্লাহর জন্য ইবাদাতকে একনিষ্ঠ অত্যাবশ্যক করে এমন ঐকান্তিক ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) তাওহীদুত ত্বলাব: কারণ, তা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে চাওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(ঙ) তাওহীদুল আমল: কারণ, তা আল্লাহ তা'আলার জন্য আমলকে একনিষ্ঠ করার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

'তাওহীদুল উলুহিয়্যা'-এর হুকুম বা বিধান:

- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ সকল বান্দার ওপর ফরয।
- বান্দারা কেবল এর দ্বারাই ইসলামে প্রবেশ করে।
- আর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আমল করলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।
- প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর এ বিশ্বাস এবং এ মোতাবেক আমল করা সর্বপ্রথম ফরয।
- আর এর দ্বারাই দাওয়াত ও শিক্ষা শুরু করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। যারা এর বিপরীত ধারণা করে তারা এতে মতনৈক্য

করেছে।

 কুরআন ও হাদীসে এর ফরয হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

 আল্লাহ এরই বাস্তবায়নের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓۚ إِلَيۡهِ أَدۡعُواْ وَإِلَيۡهِ مَـَٔابِ ٣٦﴾ [الرعد: ٣٦]

“বল, আমি তো আল্লাহর ইবাদাত করতে ও তাঁর কোনো শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন”। [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে”। [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন,

«إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» الحديث.

“হে মু‘আয, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো। সর্বপ্রথম

তাদেরকে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-) আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই- এ দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তা গ্রহণ করে, তখন তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং দরিদ্রদেরকে দেওয়া হবে"।[1]

- এ তাওহীদ যাবতীয় আমলসমূহের মধ্যে অধিকতর উত্তম আমল ও অধিক পাপ মোচনকারী। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সাহাবী ইতবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন,

«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»

"নিশ্চয় আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামকে হারাম করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে"।

- সমস্ত রাসূলগণের এ কালেমার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন: সমস্ত রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়কে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দিকে দাওয়াত দানে এবং তা থেকে বিমুখের ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে একমত ছিলেন। যেমন, কুরআন কারীমে অনেক আয়াতে এর বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

[1] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

﴿٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাঁর নিকটে এ অহী অবতীর্ণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা‘বুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর”। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কালেমার দিকে দাওয়াত দানে নবীদের একমতের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد»

“নবীগণ একে অপরে বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। তাঁদের মা ভিন্ন ছিল আর দীন এক ছিল”।

সকল নবীদের মূল দীন ছিল একই: তা হলো তাওহীদ, যদিও শরী‘আতের অন্যান্য বিধি-বিধান ভিন্ন ছিল। যেমন, কখনো ছেলে-মেয়ে মায়ের দিক থেকে ভিন্ন হয় আর তাদের পিতা হয় এক।

৩- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের অর্থ:

(ক) “নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল” এ সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো,

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেছেন তা পালন করা,

- তিনি যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা
- তিনি যে সব বিষয় সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা
- আর একমাত্র তিনি যে বিধান দান করেছেন সেটা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

(খ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন:

- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে ঈমান ও পূর্ণ ইয়াকীন দ্বারা।
- নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; যাকে সকল মানব ও জিন্ন জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন।
- তিনি শেষ নবী ও রাসূল।
- নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দা। তাঁর মাঝে উলুহিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট নেই।
- তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর আদেশ নিষেধের সম্মান করা।
- কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল”।

[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ٢٨﴾ [سبا: ٢٨]

“আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি”। [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ ٤٠﴾ [الاحزاب : ٤٠]

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০]

তিনি আরো বলেন,

﴿قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّي هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرٗا رَّسُولٗا ٩٣﴾ [الاسراء: ٩٣]

“বল, আমার রব পবিত্র! আমি কেবল একজন মানুষ যাকে রাসূল বানানো হয়েছে”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৯৩]

উক্ত সাক্ষ্য নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথমত: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে তার বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়ত: কালেমার এ অংশের উচ্চারণ করা ও মুখের দ্বারা প্রকাশ্যভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া।

তৃতীয়ত: যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তা অনুসরণ করা এবং যে বাতিল বিষয়সমূহ থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পার”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

চতুর্থত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।

পঞ্চমত: জান-মাল, ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের ভালোবাসার চাইতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক ভালোবাসা। কারণ, তিনি আল্লাহর রাসূল আর তাঁকে ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত।

আর তাঁর প্রকৃত মুহাব্বাত হলো তাঁর আদেশসমূহের আনুগত্য করে তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থেকে তাঁর অনুসরণ করা। তাঁকে সাহায্য করা, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ ٣١﴾

[آل عمران: ٣١]

“বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»

“তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হবো”।[2]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧﴾ [الاعراف: ١٥٧]

“সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে সেটার অনুসরণ করে তাঁরাই সফলকাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

ষষ্টত: তাঁর সুন্নাতের ওপর আমল করা। তাঁর কথাকে সকলের কথার ওপর প্রাধান্য দেওয়া, নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। তাঁর শরী‘আত মোতাবেক বিধান পরিচালনা করা এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

2 ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء : ٦٥]

“কিন্ত না, তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সন্ধন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

৪- সাক্ষ্যদ্বয়ের ফযীলত:

কালেমায়ে তাওহীদ-এর অনেক ফযীলত রয়েছে, যা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তার কিছু ফযীলত নিম্নে বর্ণিত হলো:

(ক) এটি ইসলামের প্রথম স্তম্ভ, দীনের মূল, মিল্লাতের ভিত্তি। এর দ্বারাই বান্দা সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করে। এর বাস্তবায়নের জন্যই আসমান জমিনের সৃষ্টি।

(খ) এটি জান-মাল হিফাযতের কারণ। যে ব্যক্তি এটি উচ্চারণ করবে তার জান-মাল হিফাযতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(গ) সাধারণভাবে এটি সর্ব উত্তম আমল, অধিক পাপমোচনকারী, জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ। যদি আসমান ও জমিন এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর পাল্লা ঝুঁকে যাবে বা ভারী প্রমাণিত হবে।

তাই ইমাম মুসলিম সাহাবী উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু‘

হাদীস বর্ণনা করেছেন,

«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حرّم الله عليه النّار»

“যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।”

(ঘ) আর তাতে যিকির, দো‘আ ও প্রশংসা সন্নিবেশিত রয়েছে। ইবাদাতের মাধ্যমে কৃত দো‘আ ও চাওয়ার জন্য কৃত দো‘আ উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ যিকির অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় এবং এটি অতি সহজে অর্জন করা যায়। এটি পবিত্র কালেমা, দৃঢ় হাতল, কালেমাতুল ইখলাস, এর বাস্তবায়নের জন্য আসমান জমিনের সৃষ্টি। এর জন্যই সৃষ্টি জীবের সৃষ্টি, রাসূলগণের প্রেরণ, কিতাবসমূহের অবতীর্ণ, এরই পরিপূর্ণতার জন্য ফরয ও সুন্নাত প্রবর্তন হয়েছে। আর এরই জন্য জিহাদের তরবারী কোষমুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে ও এর প্রতি আমল করবে সত্য জেনে, ইখলাসের সাথে, গ্রহণ করে ও মুহাব্বাতের সাথে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার কর্ম যাই হউক না কেন।

দ্বিতীয় রুকন: আস-সালাত

সালাত ইবাদাতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এর ফরয হওয়ার দলীল অত্যন্ত সুস্পষ্ট, ইসলাম এ বিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুতরাং ইবাদাতসমূহে সালাতের ফযীলত ও তাৎপর্য কতটুকু তা বর্ণনা করেছে। আর তা বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্কসৃষ্টিকারী, এর প্রতিষ্ঠার দ্বারা বান্দা তার প্রভুর আনুগত্য প্রকাশ করে।

১- সালাতের সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থ: সালাতের শাব্দিক অর্থ দো‘আ, এ অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তুমি তাদের জন্য দো‘আ কর, তোমার দো‘আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

পারিভাষিক অর্থ: এটি এমন এক ইবাদাত যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, ‘আল্লাহু আকবার’ দ্বারা শুরু হয়, ‘আসসালামু আলাইকুম’ দ্বারা শেষ হয়।

কথা থেকে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহু আকবার বলা, ক্বিরাত, তাসবীহ ও দো‘আ ইত্যাদি পাঠ করা।

কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য, ক্বিয়াম-দাঁড়ানো, রুকু করা, সাজদাহ করা ও বসা ইত্যাদি।

২- নবী ও রাসূলগণের নিকট এর গুরুত্ব:

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের পূর্বের আসমানী দীনসমূহে সালাত বিধিবদ্ধ ছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রভুর কাছে নিজের ও স্বীয় বংশধরের সালাত প্রতিষ্ঠার দো'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ ٤٠﴾ [ابراهيم: ٤٠]

"হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর পরিবারকে সালাত প্রতিষ্ঠার আদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ ٥٥﴾ [مريم: ٥٥]

"সে তাঁর পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত"। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾ [طه: ١٤]

"আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব, আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর"। [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১৪]

আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের ব্যাপারে তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ١٣﴾

[مريم: ٣١]

“যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি‘রাজ ও ইসরার রাত্রিতে আসমানে সালাত ফরয করেছেন। আর সালাত ফরয কালে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হালকা করে পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন। যা আদায়ে পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু স‍াওয়াবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তা হলো, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এর ওপর সকল মুসলিমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩- সালাত শরী‘আতসম্মত হওয়ার দলীল:

সালাতের শরী‘আতসম্মত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে একাধিক দলীল দ্বারা। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হলো:

প্রথমত: কুরআন থেকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٣٤﴾ [البقرة: ٤٣]

“তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠٣]

“নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ ٥﴾ [البينة: ٥]

“তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্টভাবে তাঁর ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে”। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

দ্বিতীয়ত: হাদীস থেকে,

(১) ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। বায়তুল্লাহর হজ করা। রামাদানের সাওম পালন করা”।[3]

(২) উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, যাতে রাসূল

[3] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً».

“ইসলাম হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদান মাসের সাওম পালন করা, সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ-এর হজ করা”।[4]

(৩) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর হাদীস,

«أن النبي -ﷺ- بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» [متفق عليه].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন এবং (তাঁকে) বললেন, যে, তুমি তাদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দানের দিকে আহ্বান কর। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন”।[5]

---

[4] সহীহ মুসলিম।

[5] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

তৃতীয়ত: ইজমা

সকল মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার ওপর একমত হয়েছেন। আর তা ইসলামের ফরযসমূহের অন্যতম একটি ফরয।

৪- সালাত প্রবর্তনের হিকমাত:

একাধিক হিকমাত ও রহস্যকে সামনে রেখে সালাত প্রবর্তন করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা হলো,

(১) আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার দাসত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে, সে তাঁর দাস, এ সালাত আদায়ের দ্বারা মানুষ 'উবূদিয়াত' বা দাসত্বের অনুভূতি লাভ করে এবং সে সর্বদা তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

(২) এ সালাত তার প্রতিষ্ঠাকারীকে আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনকারী ও সর্বদা স্বরণকারী করে রাখে।

(৩) সালাত তার আদায়কারীকে নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর তা বান্দাকে পাপ ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র করার মাধ্যম।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসই তার প্রমাণ। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مثل الصلوات كمثل نهر جار يمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يـوم خمس مرات».

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপমা ঐ প্রবাহমান নদীর ন্যায় যা তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, তথায় সে প্রতি দিন পাঁচ বার

গোসল করে”।[6]

(৪) সালাত অন্তরের তৃপ্তি, আত্মার শান্তি, ও মুক্তিদানকারী ঐ বিপদ-আপদ থেকে যা তাকে কলুষিত করে। এ জন্যই তা রাসূলের নয়ন সিক্তকারী ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি সালাত আদায়ের দিকে ছুটে যেতেন। এমনকি তিনি বলতে থাকতেন,

«يا بلال أرحنا بالصلاة».

“হে বিলাল! সালাতের দ্বারা তুমি আমাকে শান্তি দাও”।[7]

৫- কাদের ওপর সালাত ফরয?

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তির ওপর সালাত ফরয। চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। কাফিরের ওপর সালাত ফরয নয়। এর অর্থ- দুনিয়াতে সে এর আদিষ্ট নয়। কারণ, তার কুফুরী অবস্থায় তার পক্ষ থেকে তা শুদ্ধ হবে না। তবে তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আখিরাতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করে তা আদায় করা তার জন্য সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা করে নি।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ٤٧﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٧]

---

[6] সহীহ মুসলিম।

[7] আহমদ।

“তোমাদেরকে কিসে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা অযথা আলোচনাকারীদের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম, আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমণ পর্যন্ত”। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৭]

আর বাচ্চাদের ওপরও ফরয নয়। কারণ, সে মুকাল্লাফ-প্রাপ্তবয়স্ক নয়। পাগলের ওপরও ফরয নয়। ঋতু ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের ওপরও ফরয নয়। কারণ, শরী‘আত তাদের থেকে এর বিধান তুলে নিয়েছে, তা আদায়ে বাধাপ্রদানকারী নাপাকির কারণে।

বাচ্চা সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তার অভিভাবকের ওপর তাকে সালাতের আদেশ দেওয়া আবশ্যক। আর যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত আদায় না করলে তার অভিভাবকের ওপর তাকে প্রহার করা আবশ্যক। হাদীসে এর বর্ণনা এসেছে। যাতে সে তা আদায়ে অভ্যস্ত ও আগ্রহী হয়।

৬- সালাত ত্যাগকারীর বিধান:

যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল এবং কুফুরী করলো। ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান থেকে মুর্তাদ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তার ওপর যে বিধি-বিধান ফরয করেছেন তা ছেড়ে দিয়ে সে তাঁর নাফরমানী করেছে। তাই তাকে তাওবার আদেশ দেওয়া হবে। যদি তাওবা করে

ও সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরে আসে তবে ভালো, অন্যথায় সে ইসলাম থেকে মুর্তাদ হয়ে যাবে। তার গোসল, কাফন, জানাযার সালাত পড়া, মুসলিমদের কবরে দাফন করা নিষেধ। কারণ, সে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৭ - সালাতের শর্তসমূহ:

(1)ইসলাম তথা মুসলিম হওয়া।

(2)জ্ঞানবান হওয়া।

(3)ভালো-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান থাকা।

(4)সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া।

(5)নিয়াত করা।

(6)ক্বিবলামুখী হওয়া।

(7)সতর ঢাকা, পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর মহিলা তার সম্পূর্ণ শরীরই সালাতে সতর, তার মুখ ও হাতের তালুদ্বয় ছাড়া।

(8)মুসল্লির কাপড়, শরীর ও সালাত পড়ার স্থান থেকে নাপাকি দূর করা।

(9)হাদছ দূর করা আর তা-নাপাকি থেকে অযু গোসল করে পবিত্র হওয়াকে বুঝায়।

৮ - সালাতের সময়:

(১) যোহর সালাতের সময়: সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে, অর্থাৎ মধ্য আকাশ থেকে সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়া থেকে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

(২) আসর সালাতের সময়: যোহর সালাতের সময় চলে যাওয়া থেকে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। আর তা হলো সূর্য হলোদে হওয়া সময় পর্যন্ত।

(৩) মাগরিব সালাতের সময়: সূর্য ডুবা থেকে নিয়ে লালিমা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত। আর তা হলো ঐ লালচে ভাব যা পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবার পর প্রকাশিত হয়।

(৪) ঈশার সালাতের সময়: মাগরিবের সালাতের সময় চলে যাওয়া থেকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

(৫) ফজর সালাতের সময়: ফজরে সানী প্রকাশ হওয়া থেকে নিয়ে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة---».

“যোহরের সময়: যখন সূর্য ঢলে যাবে, মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হবে। আসরের সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত থাকবে। আর মাগরিবের সালাতের সময় সূর্য ডুবা *থেকে* নিয়ে লালিমা পর্যন্ত। আর ইশার সালাতের সময় মাগরিবের সালাতের সময় চলে যাওয়া থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের সালাতের সময় ফজর প্রকাশিত হওয়া

থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আর তখন (সূর্য উদয়ের সময়) সালাত পড়া থেকে বিরত থাক”।[৪]

৯- ফরয সালাতের রাকাতের সংখ্যা:

ফরয সালাতের রাকাতের সংখ্যা, সর্বমোট সতের রাকাত। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলো:

(1)যোহর: চার রাকাত।

(2)আসর: চার রাকাত।

(3)মাগরিব: তিন রাকাত।

(4)ঈশা: চার রাকাত।

(5)ফজর: দু’ রাকাত।

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ রাকাতের সংখ্যায় বাড়ায় বা কমায়, তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তা ভুলবশতঃ হয়, তবে তা সাজদাহ সাহুর দ্বারা পূর্ণ করবে। এ সংখ্যা মুসাফির ব্যক্তির জন্য নয়। তার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতগুলো দু’ রাকাতে কছর করে পড়া মুস্তাহাব। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার নির্ধারিত সময়ে পড়া মুসলিম ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব, যদি কোনো শার‘ঈ ওযর (যেমন, নিদ্রা, ভুলে যাওয়া, ভ্রমণে যাওয়া) না থাকে। যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যাবে বা ভুলে যাবে সে তা পড়ে নিবে যখন স্মরণ হবে।

১০- সালাতের ফরযসমূহ:

(1)সামর্থ্য থাকলে দাঁড়ানো।

---

৪ সহীহ মুসলিম

(2) তাকবীরে তাহরীমাহ।

(3) সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

(4) রুকু‘ করা।

(5) রুকু‘ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

(6) সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ করা।

(7) সাজদাহ থেকে উঠা।

(8) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

(9) তাশাহহুদকালে বসা।

(10) সালাতের এ রুকনগুলো সম্পাদনে স্থিরতা বজায় রাখা।

(11) এ রুকনগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা।

(12) ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান করা বা সালাম ফিরানো।

১১- সালাতের ওয়াজিবসমূহ:

সালাতের ওয়াজিব আটটি। যথা-

প্রথম: তাকবীরে তাহরীমাহ’র তাকবীর ছাড়া সালাতে অন্যান্য তাকবীরসমূহ।

দ্বিতীয়:

«سمع الله لمن حمده»

(সামি‘য়াল্লাহু লিমান হামিদা) বলা।

আর তা ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য ওয়াজিব। তবে

মুক্তাদী তা পাঠ করবে না।

তৃতীয়: ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী সকলের ওপর

«ربنا ولك الحمد»

(রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) বলা ওয়াজিব।

চতুর্থ: রুকুতে

«سبحان ربي العظيم»

(সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম) বলা।

পঞ্চম: সাজদায়

«سبحان ربي الأعلى»

(সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা) বলা।

ষষ্ঠ: দু' সাজদাহ'র মাঝে

«رب غفر لي»

(রাব্বিগফিরলী) বলা।

সপ্তম: প্রথম বৈঠকে আত-তাহিয়্যাত পড়া, আর তা হলো,

«التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمـداً عبده ورسوله»

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্

তাইয়্যেবা-তু, আস্সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আসসসালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্ স্ব-লিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

বা অনুরূপ প্রমাণিত তাহিয়্যাত পাঠ করা।

অষ্টম: প্রথম বৈঠকের জন্য বসা।

আর যারাই ইচ্ছাকৃতভাবে এ ওয়াজিবসমূহের কোনো একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তাদেরই সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিবে অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ সে সাহু সাজদাহ দিবে।

১২- জামা'আতে সালাত:

মাসজিদে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া মুসলিম ব্যক্তির ওপর আবশ্যক। এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে।

একা সালাত পড়ার চাইতে জামা'আতে সালাত পড়ার ছাওয়াব সাতাশ গুণ বেশি। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

“জামা'আতে সালাত পড়া, একা সালাত পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ

(সাওয়াব) বেশি”।[9]

তবে মুসলিম নারীর নিজ বাড়ীতে সালাত পড়া জামা‘আতে সালাত পড়ার চাইতে উত্তম।

১৩- সালাত বাতিল (নষ্ট)-কারী বিষয়সমূহ:

নিম্নেবর্ণিত কর্মসমূহের যে কোনো একটি কর্ম সম্পাদনের দ্বারা সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

(১) ইচ্ছাকৃত পানাহার করা।

যে ব্যক্তি সালাত অবস্থায় পানাহার করবে তার ওপর ঐ সালাত পুনরায় পড়া আবশ্যক হওয়ার ওপর আলিমগণের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে।

(২) সালাতের স্বার্থ বহির্ভূত এমন বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কথা বলা। এ ব্যাপারে যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كنا نتكلم في الصلاة»

“আমরা সালাতে কথা বলতাম, আমাদের কেউ কেহ সালাতে তার পাশের সাথীর সাথে কথা বলতো। এমতাবস্থায় নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলো,

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨]

“আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াও”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮]

9 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

«فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام».

"অতঃপর আমরা চুপ থাকার আদেশ প্রাপ্ত হলাম। আর কথা বলা হতে নিষেধপ্রাপ্ত হলাম"।[10]

এমনিভাবে ইজমা সংঘটিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির সালাত ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে যে, সালাতের স্বার্থ বহির্ভূত ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত কথা বলবে।

(৩) ইচ্ছাকৃত অনেক বেশি কাজ করা। আর অধিক কাজের পরিমাণ নির্ণয় করার মানদণ্ড হলো, সালাত আদায়কারীর দিকে দৃষ্টিপাতকারীর নিকট মনে হবে যে, সে সালাতের মাঝে নয়।

(৪) বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত সালাতের কোনো রুকন বা শর্ত ছেড়ে দেওয়া। যেমন বিনা অযুতে সালাত পড়া, বা ক্বিবলামুখী না হয়ে সালাত পড়া। অর্থাৎ ক্বিবলা ছেড়ে অন্য দিক হয়ে সালাত পড়া।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বেদুঈনকে বলেছেন, যে তার সালাত সুন্দর করে পড়তে পারে নি,

«ارجع فصل فإنك لم تصلّ»

"ফিরে যাও সালাত পড়, কেননা তুমি সালাত পড় নি"।

(৫) সালাতে হাসা। কারণ, হাসি দ্বারা সালাত বাতিল হয়ে যাওয়ার ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

১৪- সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ:

[10] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম

(1)ফজর সালাতের পর হতে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত।

(2)ঠিক দুপুর সময়।

(3)আসর সালাতের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত।

এ সময়সমূহে সালাত পড়া মাকরূহ হওয়ার ওপর দলীল হলো উক্কবা ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বলেন,

«ثلاث ساعات كان رسول الله- ﷺ- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَّف الشمس للغروب حتى تغرب».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত পড়তে ও আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফন করতে নিষেধ করতেন:

(১) সূর্য স্পষ্টভাবে উদিত হওয়ার শুরুর সময় থেকে নিয়ে তা (উর্ধ্বে উঠা) পর্যন্ত।

(২) ঠিক দুপুরে সূর্য উঁচুতে থাকা থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত।

(৩) সুর্য অস্তমুখী হওয়া থেকে নিয়ে তা ডুবা পর্যন্ত।[11]

আরো দলীল হলো, আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».

[11] সহীহ মুসলিম।

"আসরের সালাতের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত কোনো সালাত নেই, অনুরূপ ফজরের সালাতের পর থেকে নিয়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কোনো সালাত নেই"।[12]

১৫- সালাতের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

মুসলিম ব্যক্তির ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। সালাত পড়ার পদ্ধতিও তাঁর অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তিনি বলেছেন,

«صلوا كما رأيتموني أصلي».

"তোমরা সালাত পড়, যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ"।[13]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত পড়ার ইচ্ছা করতেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতেন। অন্তরে সালাতের নিয়্যাত করতেন, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি।

আর «الله أكبر» "আল্লাহু আকবার" বলে তাকবীর দিতেন। এ তাকবীরের সাথে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন দুই কাঁধ সমপরিমাণ, আবার কখনো কখনো দুই কানের লতি পর্যন্ত। তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুকের উপর ধারণ করতেন।

সালাত আরম্ভ করার দো'আসমূহের যে কোনো একটি দো'আ দিয়ে সালাত শুরু করতেন তন্মধ্যে এটি:

---

[12] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[13] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

«سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তা‘আ-লা জাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।

“হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই”।

এ দো‘আটি সালাত আরম্ভ করার দো‘আসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তার পর সূরা ফাতিহা পড়তেন, তারপর সেটার সাথে আরো একটি সূরা পড়তেন। তার পর হস্তদ্বয় (প্রথম বারের ন্যায়) উত্তোলন করে তাকবীর দিয়ে রুকুতে যেতেন আর রুকুতে পিঠ সোজা করে রাখতেন, এমনকি যদি নিজের পিঠের উপর পানির পাত্র রাখা হত, তবে তা স্থীর থাকতো। সেখানে «سبحان ربي العظيم» “সুবহা-না রাবিবয়াল আযীম” তিনবার পড়তেন। অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুখে

«سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»

“সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া-লাকাল হামদ” বলে রুক◌ু থেকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন।

অতঃপর তাকবীর বলে সাজদাহ করতেন, সাজদাহ অবস্থায় নিজ হস্তদ্বয় নিজ বক্ষের পার্শ্ব দ্বয় থেকে দূরে রাখতেন, এতে বগলের শুভ্র প্রকাশিত হয়ে যেত। তাঁর সাত অঙ্গ, নাক সহ কপাল, তালুদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পাদ্বয়ের মাথা, মাটিতে রেখে সাজদাহ করতেন, সেখানে «

«سبحان ربي الأعلى» "সুবহা-না রাবিবয়াল আ'লা" তিনবার বলতেন।

অতঃপর ডান পা খাড়া রেখে সকল আঙ্গুলের মাথা ক্বিবলামুখী করে আল্লাহু আকবার বলে বাম পায়ের উপর বসতেন। আর এ বৈঠকে,

«رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارفعني»

উচ্চারণ: রাব্বিগফিরলি ওয়ারহাম্নী ওয়াজাবুরনী ওয়ারফা'নী ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারফা'নী।- এ দো'আ তিনবার পড়তেন।

অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন ও সাজদাহ করতেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য তাকবীর দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাকাতে অনুরূপ করতেন।

অতঃপর দু' রাকাতের পর যখন প্রথম বৈঠকের জন্য বসতেন তখন বলতেন,

«التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-ওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-তু, আস্সালা-মু আলাইকা আইউ হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আসসালা-মু আলাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

তারপর তাকবীর দিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে দু' হাত উত্তোলন করতেন। (তৃতীয় রাকাতের জন্য) আর তা হচ্ছে সালাতের চতুর্থ স্থান যেখানে

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠকে অর্থাৎ মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতের শেষে অথবা যোহর, আসর ও 'ঈশার চতুর্থ রাকাতের শেষে বসতেন তখন তাওয়াররুক করে বসতেন। অর্থাৎ বাম পা ডান পায়ের নলীর নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে ডান পা কিবলামুখী অবস্থায় খাড়া রেখে নিতম্বের ওপর বসতেন। হাতের সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ রাখতেন, শুধু শাহাদাত আঙ্গুল তার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইশারা বা নাড়ানোর জন্য খোলা রাখতেন।

অতঃপর যখন তাশাহহুদ শেষ করতেন তখন ডান দিকে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও বাম দিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেতো।

সালাতের এ পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ হচ্ছে সালাতের বিধানসমূহের কিছু বিধান, যার ওপর কর্মের সঠিকতা নির্ভর করে, আর যদি বান্দার সালাত ঠিক হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সালাত নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যায় তবে তার সকল কর্ম নষ্ট-ফাসেদ হয়ে যাবে। আর কিয়ামাত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেওয়া হবে যদি সে তা পুরোপুরিভাবে আদায় করে তবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হবে। আর যদি সে তা থেকে কিছু ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হবে। আর সালাত মানুষকে বেহায়াপানা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত

রাখে এবং তা মানব আত্মার রোগের চিকিৎসা, যাতে তা (আত্মা) হীনস্বভাব থেকে পরিস্কার পরিছন্ন হতে পারে।

তৃতীয় রুকন: যাকাত

১- যাকাতের সংজ্ঞা:

যাকাতের শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া। কখনো প্রশংসা, পবিত্রকরণ ও সংশোধন এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মালের যে অংশ বের করা হয় তাকে যাকাত বলে। কারণ, এর দ্বারা বরকতের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায় আর ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তিকে পবিত্র করা হয়।

যাকাতের পারিভাষিক অর্থ: নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠির জন্য নির্ধারিত মালে অত্যাবশকীয় হক্ব বের করা।

২- ইসলামে যাকাতের স্থান:

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ।

আল-কুরআনে বহু স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের আলোচনা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٤٣﴾ [البقرة: ٤٣]

“তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৪৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ٥﴾ [البينة: ٥]

“এবং (তারা আদিষ্ট হয়েছিল) সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে”। [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بني الإسلام على خمس» وذكر منها «إيتاء الزكاة».

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে যাকাত আদায় করা অন্যতম একটি রুকন”।[14]

আল্লাহ মানব জাতির আত্মাকে কৃপণতা, বখীলতা ও লোভ-লালসা থেকে পবিত্র করার জন্য, ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্য, মালকে পবিত্র ও বৃদ্ধি করার জন্য, তথায় বরকত অবতীর্ণ করার জন্য, তাকে বিপদ-আপদ ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য এবং জাতির জীবনে সৌহার্দ্য ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাকাত প্রবর্তন করেছেন।

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকাত গ্রহণের হিকমাত উল্লেখ করেছেন।

যেমন তিনি বলেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করবে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

৩- যাকাতের বিধান:

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি মালের শর্তানুযায়ী নিসাবের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয। এমনকি বাচ্চা ও পাগলদের পক্ষ থেকে তাদের

[14] এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়েই ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

অভিভাবক তাদের মালের যাকাত আদায় করবেন। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা ও অলসতা করে যাকাত দিবে না এর জন্য তাকে ফাসেক ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত বলে গণ্য করা হবে। আর তার যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ ٤٨﴾ [النساء: ٤٨]

“আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যে কোনো অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, আর হারামে পতিত হওয়ায় তাকে তা‘জির (অনির্ধারিত শাস্তি) প্রদান করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা যাকাত অস্বীকারকারীকে নিম্নের বাণী দ্বারা সাবধান করেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]

“আর যারা সোনা রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন।

যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং সেদিন বলা হবে) এটা তো তা-ই যা তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»

“মালের মালিক যাকাত আদায় না করলে সে মালকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে তক্তা বানানো হবে, তারপর তা দিয়ে তার পার্শ্বদ্বয় ও ললাটে দাগ দিতে থাকবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করা পর্যন্ত ঐ দিনে, যে দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। তারপর সে জান্নাতী হলে জান্নাতের পথ আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের পথ দেখবে”।[15]

৪- যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত:

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে,

প্রথম শর্ত: ইসলাম, সুতরাং কাফিরের ওপর যাকাত ফরয নয়।

দ্বিতীয় শর্ত: স্বাধীন, অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট দাসের মালে

[15] হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে শব্দগুলো মুসলিমের।

যাকাত ফরয নয়। অনুরূপ মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ কৃতদাস মালের ওপর যাকাত ফরয নয়। কারণ, তার ওপর এক দেরহাম আদায় অবশিষ্ট থাকলেও সে দাস হিসাবে গণ্য।

তৃতীয় শর্ত: নিসাবের মালিক হওয়া, আর যদি মাল নিসাব পূর্ণ না হয়, তবে তাতে যাকাত ফরয নয়।

চতুর্থ শর্ত: মালের পূর্ণ মালিক হওয়া, আর তাই নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে যাকাত ফরয নয়:

- মুকাতাবের দাঈন বা ঋণে যাকাত ফরয নয়।
- বন্টনের পূর্বে মুদারিব অর্থাৎ মুদারাবা (যৌথ ব্যবসায়) লেন-দেনে অংশ গ্রহণকারীর লভ্যাংশে যাকাত ফরয নয়।
- অসচ্ছল ব্যক্তির ওপর যে ঋণ রয়েছে তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয নয়।
- আর যে মাল কল্যাণ ও পূণ্যের পথে যেমন মুজাহিদের, মসজিদের, বসবাসের ও অনুরূপ খাতে ওয়াক্ফ তাতে যাকাত ফরয নয়।

পঞ্চম শর্ত: এক বছর অতিবাহিত হওয়া। এক বছর অতিবাহিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো মালেই যাকাত ফরয নয়। তবে জমি থেকে উৎপন্ন ফসল ও ফল-মূল ছাড়া। কারণ, তার যাকাত ফরয হবে তা কাটার ও পাড়ার সময়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ١٤١﴾ [الانعام: ١٤١]

“এবং ফসলের হক্ক আদায় কর তা কাটার দিবসে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১]

আর খনিজ সম্পদ ও রিকায (মাটিতে পুঁতে রাখা) সম্পদের যাকাতের বিধান জমি থেকে উৎপন্ন ফসল ও ফলের যাকাতের বিধানের ন্যায়, কারণ, তা জমি থেকে সংগৃহিত মাল।

গৃহপালিত পশুর এবং ব্যবসার লভ্যাংশের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়া গণ্য হবে মূলের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়ার ন্যায়। তাই গৃহপালিত পশুর উৎপাদিত ও ব্যবসার লভ্যাংশকে তার মূলধনের সাথে মিলাবে এবং নিসাব পূর্ণ হলে তার যাকাত দিবে।

আর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়া শর্ত নয়। তাই অধিকাংশ বিদ্যানগণের নিকট বাচ্চা ও পাগলের মালে যাকাত ফরয হবে।

৫- যাকাত ফরয যোগ্য সম্পদ:

পাঁচ শ্রেণির মালে যাকাত ফরয হয়:

এক: সোনা, রূপার ও অনুরূপভাবে তার স্থলাভিষিক্ত প্রচলিত কাগজের মুদ্রার ওপর যাকাত ফরয:

আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো রুবু‘উল ‘উশর (চল্লিশ ভাগের একভাগ)। আর রুব‘উল ‘উশরের পরিমাণ হলো শতকরা আড়াই ভাগ। এক বছর অতিবাহিত ও নিসাব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ফরয হবে না।

সোনার নিসাবের পরিমাণ হলো বিশ মিছকাল। আর এক মিছকালের ওজন (৪.২৫) গ্রাম। অতএব, সোনার নিসাব হলো (৮৫) গ্রাম।

রূপার নিসাবের পরিমাণ হলো দু'শত দিরহাম। আর এক দিরহামের পরিমাণ হলো (২.৯৭৫)। সুতরাং রূপার নিসাব হলো (৫৯৫) গ্রাম।

তবে বর্তমান কাগজের মুদ্রা তার নিসাবের পরিমাণ হলো, এক বছর অতিবাহিত কালে যাকাত বের করার সময় তার মূল্য পঁচাশি (৮৫) গ্রাম সোনার অথবা পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রূপার সমান হতে হবে। এ জন্য সোনা ও রূপার নিসাবের পরিমাণের তুলনায় বর্তমান কাগজের মুদ্রার নিসাব তার দর-মান কম-বেশি হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

তাই কারও কাছে তার যে কাগজের মুদ্রা রয়েছে তা দিয়ে যদি সে পূর্বে বর্ণিত সোনা বা রূপার পরিমাণে যে কোনো একটি পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম হয় বা তার চাইতে বেশি হয় তবে তাতে যাকাত ফরয হবে, তার নাম যাই হোক না কেন রিয়াল হোক বা দিনার হোক বা ফ্রাঙ্ক হোক বা ডলার হোক বা অন্য আরো যে কোনো নাম হোক। আর তার গুণাগুণ যাই হোক না কেন কাগজের মুদ্রা হোক বা খনিজ পদার্থ হোক, বা অন্য আরো কিছু হোক।

আরো প্রসিদ্ধ কথা হলো যে, মুদ্রার দর কোনো কোনো সময় পরিবর্তন হয়। তাই তাতে যখন যাকাত ফরয হবে তখন যাকাতদাতার তার মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ হবে। আর তা হলো তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া। আর যদি কোনো মাল নিসাবের চাইতে বেশি হয় তবে সেই মাল থেকে নিসাব অনুসারে যাকাত বের

করতে হবে ।

এর দলীল হলো, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».

“তুমি যদি দুই শত দিরহামের মালিক হও আর তাতে যদি এক বছর অতিবাহিত হয়। তবে তা যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হবে পাঁচ দিরহাম। যদি তোমার নিকট বিশ দিনার থাকে আর তা এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। আর এর চাইতে কম মালে যাকাত ফরয হবে না। সুতরাং এ পরিমাণের বেশি হলে এ অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। আর কোনো মালেই যাকাত ফরয হবে না এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত”।[16]

অলঙ্কার-গহনা যদি জমা ও ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি করে রাখা হয় তবে তাতে যাকাত ফরয হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর তা যদি ব্যবহারের জন্য তৈরি করে রাখা হয় তবে তাতে ফকীহগণের দু’মতের গ্রহণযোগ্য মতে যাকাত ফরয হবে। কারণ, সোনা রূপার যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে যে সকল দলীল বর্ণিত হয়েছে তা আম বা ব্যাপক।

ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী ‘আমর ইবন শু‘আইব তার

[16] হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন, আর হাদীসটি হাসান।

পিতা হতে, পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন,

«أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يدي بنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هـذا ؟ قـالت: لا، قـال:(أيسرك أن يسـورك الله بهمـا يـوم القيامة سوارين من نار) فخلعتهما وألقتهما إلى النبي ، وقالت: هما لله ولرسوله».

“জনৈক মহিলা তার মেয়েসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার মেয়ের দু’ হাতে দু’টি সোনার মোটা চুড়ি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বলল, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি ভালোবাস যে এর বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাকে আগুনের দু’টি চুড়ি পরাবেন? সাথে সাথে মহিলাটি চুড়ি দু’টি খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখল এবং বলল, এ চুড়ি দু’টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য”।

আবু দাউদ ও অন্যান্যরা ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন,

«دخل عليّ رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يـا عائشـة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسـول الله، قـال: أتـؤدين زكاتهنّ؟ قلت: لا، أو مـا شاء الله، قال: هو حسبك من النار».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে আমার হাতে অনেকগুলো রূপার আংটি দেখে বললেন, হে আয়েশা এগুলো কি? অতঃপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো আমি তৈরি করেছি আপনার সামনে সৌন্দর্য

প্রকাশ করার জন্য। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত প্রদান কর? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ যা চেয়েছেন (তা বলেছি)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর যাকাত না দেওয়াটাই তোমার জাহান্নামে যাওয়ার জ্যন যথেষ্ট"।

খনিজ-জাত ধাতব দ্রব্যের ও সোনা ছাড়া তৈরি অলঙ্কার যেমন, মুক্তা, মতি ইত্যাদিতে কোনো ফকীহগণের নিকটেও যাকাত ফরয নয়। তবে যদি ব্যবসার জন্য তৈরী করা হয় তাহলে ব্যবসার জন্য তৈরী মালের যাকাতের ন্যায় যাকাত দিতে হবে।

দুই: চতুষ্পদ জন্তু:

আর তা হলো, উট, গরু, ছাগল। আর তাতে যাকাত ফরয হবে যখন তা 'সায়েমা' হবে, আর সায়েমা এ প্রাণীকে বলে যা চারণভূমিতে লালিত-পালিত হয়; সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ দিনগুলোতে। কারণ, পূর্ণ অংশের যে বিধান তা অধিকাংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এর দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«في كل إبل سائمة صدقة».

"প্রত্যেক 'সায়েমা' উটে যাকাত রয়েছে।"[17]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো বাণী হলো,

«في صدقة الغنم في سائمتها».

[17] হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

"ছাগলের যাকাত কেবলমাত্র সায়েমা ছাগলে"।[18] যখন নিসাব পূর্ণ হবে ও এক বছর অতিবাহিত হবে।

[18] সহীহ বুখারী।

গৃহপালিত পশুর যাকাতের তালিকা

শ্রেণি	নিসাবের পরিমাণ, থেকে – পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ:
উট	৫------------৯	একটি ছাগল
	১০-----------১৪	দু'টি ছাগল
	১৫-----------১৯	তিনটি ছাগল
	২০-----------২৪	চারটি ছাগল
	২৫-----------৩৫	এক বছরের একটি মাদা উট
	৩৬-----------৪৫	দু'বছরের একটি মাদা উট
	৪৬-----------৬০	তিন বছরের একটি মাদা উট
	৬১-----------৭৫	চার বছরের একটি মাদা উট
	৭৬-----------৯০	দু'বছরের দু'টি মাদা উট
	৯১----------১২০	তিন বছরের দু'টি মাদা উট

আর যদি উটের সংখ্যা ১২০টির ওপর হয় তাহলে প্রতি ৪০টিতে দু'বছরের একটি মাদা উট। আর প্রতি ৫০টিতে তিন বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে তবে অধিকাংশ ফকীহগণের নিকট।

শ্রেণি	নিসাবের পরিমাণ, থেকে – পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ
গরু	৩০-----------৩৯	এক বছরের একটি বাছুর বা বক্না দিতে হবে
	৪০-----------৫৯	দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে
	৬০-----------৬৯	এক বছরের দু'টি বাছুর দিতে হবে

	৭০-----------৭৯	এক বছরের একটি বাছুর এবং দু'বছরের একটি বক্না দিতে হবে।

আর যদি গরুর সংখ্যা ৭৯টির ওপর হয় তাহলে প্রতি ৩০টিতে এক বছরের একটি বাছুর আর প্রতি ৪০টিতে এক বছরের একটি বক্না দিতে হবে।

শ্রেণি	নিসাবের পরিমাণ, থেকে – পর্যন্ত	নির্ধারিত পরিমাণ
ছাগল	৪০----------১২০	একটি ছাগল দিতে হবে।
	১২১---------২০০	দু'টি ছাগল দিতে হবে।
	২০১---------৩০০	তিনটি ছাগল দিতে হবে।

আর যদি ছাগলের সংখ্যা ৩০০ শত এর বেশি হয় তাহলে প্রতি ১০০ শতে একটি ছাগল দিতে হবে।

আর এর দলীল হলো, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস:

«أن أبا بكـر كتب له هـذا الكتـاب لما وجهـه إلى البحـرين: بسـم الله الـرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطء في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وّعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإذا بلغت ستة وّثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت

إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتـا الجمـل، فـإذا زادت على عشرين ومائـة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسـين حقـة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فـإذا زادت على ثلاثمائـة في كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شـاة واحـدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها».

“আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বাহরাইনে গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তখন তার নিকট এ পত্র লিখেছিলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সাদকা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলিমদের ওপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এ কাজেই মুসলিমদের যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হবে সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে ছাগল দিতে হবে (এ নিয়মে যে) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে দু’ বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছবে তখন তাতে তিন বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছিচল্লিশ থেকে ষাটে পৌঁছবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী একটি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন তা

(উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে পাঁচ বছরের একটি মাদা উট দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দু'টি তিন বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগিনী দু'টি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ বিশের ঊর্ধে হবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তিন বছরের মাদা উট এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চার বছরের মাদা উট দিতে হবে। যদি কারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদকা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তাতে ক্ষতি নেই)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি ছাগল দিতে হবে। যেসব ছাগল বিচরণ করে বেড়ায় তাতে যাকাত দিতে হবে। চল্লিশ থেকে একশ বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল, একশ বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি ছাগল, দু'শতের অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং যদি তিনশ এর অধিক হয় তবে প্রতি একশটির জন্য একটি ছাগল দিতে হবে। বিচরণ করে খায় এমন ছাগলের সংখ্যা যদি কারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দিতে হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ক্ষতি নেই)”।[19]

আরো দলীল হলো, মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস,

[19] সহীহ বুখারী।

«أن النبي بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعــة، وفي كل أربعين مسنة».

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (মু'আযকে) ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন। প্রতি ত্রিশটি গরু থেকে একটি বাছুর বা বক্না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন। আর প্রতি চল্লিশটি গরু থেকে দু'বছরের একটি বক্না গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন"।[20]

যখন নিসাব গণনা করবে তখন গৃহপালিত পশুর উৎপন্ন বস্তু তার আসলের সাথে মিলাবে। আর যদি তাছাড়া গৃহপালিত পশুর নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, তার দ্বারা একবছর অতিবাহিত গণ্য করা হবে।

আর যদি চতুষ্পদ জন্তু ব্যবসার জন্য লালিত-পালিত হয় তাহলে ব্যবসার মালের যাকাতের ন্যায় তার যাকাত দিতে হবে। আর যদি তা ব্যবহারের বা উন্নয়নের জন্য লালিত-পালিত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরয হবে না। কারণ, (এ ব্যাপারে) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস বর্ণিত আছে,

«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

"মুসলিম ব্যক্তির দাসের ও ঘোড়ার ওপর যাকাত নেই"।[21]

তিন: ফসল ও ফলাফল

অধিকাংশ ফকীহের নিকট উৎপাদিত ফসলে যাকাত ফরয হবে

---

[20] হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস্ সুনান বর্ণনা করেছেন।

[21] হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

নিসাব পূর্ণ হলে। আর তাদের নিকট তার নিসাব হলো পাঁচ ‘ওয়াসাক’। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

“পাঁচ ‘ওয়াসাক’ এর কমে যাকাত ফরয নয়”।[22]

আর এক ‘ওয়াসাক’ হচ্ছে, ষাট স্বা‘আ। সুতরাং নিসাবের পরিমাণ হলো তিনশত স্বা‘আ। ভালো গমের দ্বারা এ নিসাবের পরিমাণ হবে (৬৫২.৮০০) ছয়শত বায়ান্ন কিলোগ্রাম ও আটশত গ্রাম।

ফসল ও ফলের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার বাণী রয়েছে,

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ ١٤١﴾ [الانعام: ١٤١]

“এবং তার (ফসলের) হক্ক আদায় কর তা কাটার দিবসে”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৪১]

যে সকল ফসল বিনা পরিশ্রমে পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হলো, দশ ভাগের এক ভাগ আর যে সকল ফসল পরিশ্রমের দ্বারা পানি সরবরাহ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ হলো, বিশ ভাগের এক ভাগ।

কারণ, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে,

«فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالسواني

[22] হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

أو النضح نصف العشر»

“যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা মাটি থেকে গাছের মূলের সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে পানি চুষে নেওয়ার কারণে আবাদ হয়, তাতে উ‘শর (এক দশমাংশ) ফরয হবে। আর যে সব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের একভাগ ফরয হবে (এটাই ফসলের যাকাত)”।[23]

চার: ব্যবসা সামগ্রী

মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসার জন্য যে মাল প্রস্তুত করেছে তাকে ব্যবসা সামগ্রী বলে। তা যে কোনো শ্রেণির মাল হোক না কেন যাকাতের সাধারণ সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। নিসাব পূর্ণ হলে তাতে যাকাত ফরয হবে। ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য সোনা ও রূপার নিসাবের সমান হওয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর তা হলো বিশ মিছকাল যা পঁচাশি গ্রাম সোনার সমতুল্য। অথবা দু’শত দিরহাম যা পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপার সমতুল্য।

সোনা ও রূপা থেকে ব্যবসা সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে ফকীরদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে। ব্যবসায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য ধরা হবে না বরং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত বের করার সময়ে বাজার মূল্য ধরা হবে।

পূর্ণ মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বের করা ফরয হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ তার আসল মালের সাথে মিলাবে, যদি নিসাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার যাকাত দানে নতুন বছরের অপেক্ষা করার

[23] হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

প্রয়োজন নেই। আর যদি লভ্যাংশ ছাড়া আসল মালে নিসাব পূর্ণ না হয় তাহলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে বছর শুরু/গণ্য হবে।

পাঁচ: খনিজ সম্পদ ও রিকায বা মাটিতে পুঁতে রাখা মাল

(ক) খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ ঐ সকল বস্তু যা জমি থেকে নির্গত হয়, তথায় জন্ম নেয় যা জমির মূল্যবান উৎপন্ন নয় এবং উদ্ভিদও নয়, যেমন সোনা-রূপা, লৌহ, তামা, ইয়াকুত পাথর ও পেট্রোল ইত্যাদি। আর তাতে যাকাত ফরয। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক বাণী রয়েছে,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ٢٦٧﴾ [البقرة: ٢٦٧]

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তার মধ্যে যা পবিত্র তা তোমরা ব্যয় কর"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৬৭]

খনিজ সম্পদ যে আল্লাহ তা'আলা জমি থেকে নির্গত করেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ ফকীহের নিকট খনিজ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিসাব পূর্ণ হওয়া শর্ত। আর খনিজ সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ফরয। সোনা-রূপার যাকাতের পরিমাণের ওপর ক্বিয়াস বা তুলনা করে। তাতে এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তা যখন সংগ্রহ হবে তখনই তাতে যাকাত ফরয হবে।

(খ) রিকায-মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পদ

জাহেলি যুগের মাটিগর্ভে-গচ্ছিত সম্পদ, অথবা পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের সম্পদ যদিও জাহেলি না হয় আর তার ওপর বা তার কিছুর ওপর কুফুরের নির্দশন হয় যেমন তাদের নাম, তাদের রাজাদের নাম, তাদের ছবি, তাদের পৃষ্ঠদেশ ও শুধু তাদের প্রতিমার বক্ষদেশ থাকে (তা হলেও তা রিকায হবে)।

আর যদি তার ওপর বা তার কিছুর ওপর মুসলিমদের নিদর্শন থাকে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বা মুসলিমদের খলীফাদের কারও নাম বা কুরআন কারীমের আয়াত, তা হলে তা (লুক্বাতা) পথে পড়ে থাকা বস্তু হিসাবে গণ্য হবে।

আর যদি তাতে কোনো নির্দশন না থাকে, যেমন পাত্র, স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সাজ-সজ্জা, স্বর্ণের বিস্কুট তা হলেও তা লুক্বাতা হবে আর তা প্রচার করার আগ পর্যন্ত কেউই তার মালিক হবে না। কারণ, তা হলো মুসলিম ব্যক্তির মাল আর তা থেকে তার মালিকানা নষ্ট হয়ে যায় নি। আর রিকাযে (মাটি গর্ভে গচ্ছিত রাখা সম্পদে) এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ফরয।

কারণ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وفي الركاز الخمس».

“আর ‘রিকাযে’ এক-পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে”।

অধিকাংশ ফকীহের নিকট রিকায, কম হোক বা বেশি হোক তাতে

যাকাত ফরয হবে। তাদের নিকট তা বন্টনের খাত হলো ‘ফাই’ (‘যুদ্ধবিহীন অমুসলিম শত্রুর সম্পদ যা মুসলিমরা অর্জন করে’ সেটার) বন্টনের খাত। যে ব্যক্তি তা পাবে সে বাকী রিকাযের মালিক হবে, এতে ফকীহগণের কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশিষ্ট রিকায তার প্রাপককে দিয়েছিলেন।

৬- যাকাত বন্টনের খাতসমূহ:

আট শ্রেণির লোক যাকাত পাওয়ার হক্বদার। তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

প্রথমত: ফকীর: আর তারা হলেন ঐ সকল লোক যাদের কাছে জীবন যাপনের কোনো কিছুই নেই, অথবা কিছুটা আছে, তাদেরকে পূর্ণ বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ যাকাত থেকে দেওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত: মিসকীন: যাদের নিকট তাদের প্রয়োজনের অর্ধেক বা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি খাবার রয়েছে। এ অর্থে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের অবস্থার চেয়ে ভালো। তাদেরকে তাদের পুরা বছরের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ যাকাত দেওয়া যাবে।

তৃতীয়ত: যাকাত আদায়কারী: আর তারা হলেন, ঐ সমস্ত কর্মচারী যারা যাকাতদাতাদের নিকট থেকে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নেতার আদেশে তার হক্বদারের নিকট বিতরণ করেন। তাদেরকে তাদের কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে যাকাত প্রদান করা যাবে।

চতুর্থত: যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে, আর তারা দু’ শ্রেণির লোক: কাফির এবং মুসলিম।

- কাফিরকে যাকাত তখন দেওয়া হবে যখন তার ইসলাম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করা যাবে, বা তাকে যাকাত দেওয়ার কারণে মুসলিমদের ওপর থেকে তার অত্যাচার অনিষ্ট বন্ধ হবে। আরো অনুরূপ কারণে।

- আর মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হবে তার ইসলাম গ্রহণকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা তার মত আরও একজনের ইসলাম গ্রহণের আশায়। এর মত অন্য আরো কারণে।

পঞ্চমত: দাসসমূহ, আর তারা হলেন ঐ সমস্ত 'মুকাতিব' দাস যাদের কাছে তাদের মালিকের সাথে কৃত চুক্তি পরিশোধের পয়সা নেই। তাই মুকাতিব দাসকে যাকাত থেকে যে পরিমাণ প্রদান করলে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে সামর্থ্যবান হবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা যাবে।

ষষ্ঠতম: ঋণগ্রস্তদেরকে, আর তারা দু' ভাগে বিভক্ত: নিজেদের জন্য ঋণগ্রস্ত, অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত।

- **নিজের জন্য ঋণগ্রস্ত হচ্ছে,** ঐ ব্যক্তি যে নিজের অভাবের কারণে ঋণ করেছে আর তা পরিশোধে সে সামর্থ্যবান নয়। তাই যাকাত থেকে তাকে যে পরিমাণ দিলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা যাবে।

- **অন্যের কারণে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে,** ঐ ব্যক্তি যে পরস্পরের মাঝে সংশোধন-ফায়সালা করার জন্য ঋণী হয়েছে। তাই সে ঋণী হলে যাকাত থেকে যে পরিমাণ দিলে সে ব্যাপারে তার সহযোগিতা হবে, সে পরিমাণ তাকে প্রদান করা যাবে।

সপ্তমত: যারা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছেন তাদেরকে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা জিহাদে রয়েছেন। সুতরাং যে সকল মুজাহিদদের বেতন রাষ্ট্রিয় কোষাগার থেকে নির্ধারিত নেই তাদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

অষ্টমত: মুসাফির, আর তা হচ্ছে ঐ মুসাফির, যার সব কিছু রাস্তায় শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে তার দেশে পৌঁছার মতো খরচ নেই। সুতরাং যাকাত থেকে যে পরিমাণ তাকে দিলে সে তার দেশে পৌঁছতে পারবে সে পরিমাণ যাকাত তাকে প্রদান করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা এ শ্রেণিগুলো তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

“বস্তুতঃ সাদকা ফকীরদের, মিসকীনদের, তা আদায়কারীদের, যাদের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্য হবে তাদের, দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর কর্তৃক ফরয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

৭- যাকাতুল ফিতর:

(ক) যাকাতুল ফিত্বর বিধিবদ্ধ করার হিকমাত বা রহস্যঃ

সিয়াম পালনকারীদেরকে অনর্থক কথা, বাজে কাজ ও তার আনুসাঙ্গিক কর্ম থেকে পবিত্র করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া থেকে মুক্ত রাখার জন্যও তা চালু করা হয়েছে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন,

«فـرض رسـول الله ﷺ زكاة الفطـر طهـرة للصـائم من اللغـو والـرفث وطعمـة للمساكين».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, সিয়াম পালনকারীদেরকে অনর্থক কথা বা বাজে কাজ ও তার আনুসাঙ্গিক কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে”।[24]

(খ) যাকাতুল ফিতর-এর বিধান:

যাকাতুল ফিত্বর প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী, ছোট বড়, স্বাধীন-ও দাস দাসীর ওপর ফরয।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন,

«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شـعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بهـا أن تـؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাদান মাসের যাকাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন, খেজুর বা যবের এক স্বা‘আ, দাসের, স্বাধীন ব্যক্তির, পুরুষের, নারীর ছোটদের ও বড়দের ওপর এবং তা

[24] হাদীসটি আবূ দাউদ এবং ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের সালাতের জন্য মানুষের বের হওয়ার পূর্বে”।[25]

যে শিশুর জন্ম হয় নি, পেটে রয়েছে, তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা মুস্তাহাব। নিজের, নিজ স্ত্রী ও নিকটবর্তী আত্মীয় যাদের ভরণ পোষণ করা তার দায়িত্ব রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে ফিৎরা আদায় করা ফরয।

ফিৎরা শুধুমাত্র তার ওপর ফরয যার খাদ্য ও ভরণ পোষণ করা তার ওপর দায়িত্ব তাদের খাদ্য ঈদের দিন ও রাত্রির জন্য যথেষ্ট হয়ে বেশি হবে।

(গ) ফিৎরার পরিমাণ:

শহরের প্রধান খাদ্য যেমন, গম, যব, খেজুর, কিসমিস-মুনাক্কা, পনির, চাল ও ভুট্টা থেকে যাকাতুল ফিতরের নির্ধারিত পরিমাণ হলো এক স্বা‘আ। আর এক স্বা‘আ প্রায় দু’ কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম এর সমান।

আর অধিকাংশ ফকীহগণের নিকট ফিৎরার মূল্য দেওয়া জায়েয নয়। কারণ, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ দিয়েছেন তার বিপরীত এবং সাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

(ঘ) ফিৎরা আদায় করার সময়:

ফিৎরা আদায় করার দু’টি সময় রয়েছে

(ক) জায়েয সময়: আর তা হলো, ঈদের একদিন বা দু’ দিন আগে

[25] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

আদায় করা।

(খ) উত্তম সময়: আর তা হলো, ঈদের দিনের ফজর উদিত হওয়া থেকে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা আদায় করা।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের ঈদের সালাতের জন্য বের হয়ে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। যাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ নয়।

কেউ যদি তা ঈদের সালাতের পরে আদায় করে তবে তা সাধারণ সাদকা (দান) হিসাবে গণ্য হবে। আর সে এ বিলম্বের কারণে গুনাহগার হবে।

(ঙ) যাকাতুল ফিতর বিতরণের খাত:

যাকাতুল ফিত্বর ফকীর ও মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কারণ, অন্যদের চাইতে এরাই এর অধিক হক্বদার।

চতুর্থ রুকন: রামাদানের সিয়াম পালন

১- সিয়াম এর সংজ্ঞা:

সিয়ামের শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থ: সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার সাওম ভঙ্গের কারণ থেকে বিরত থাকা।

২- রামাদান মাসের সিয়াম পালনের বিধান:

ইসলামের রুকনসমূহের অন্যতম একটি রুকন ও তার মহান স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

"হে মুমিনগণ ! তোমাদের ওপর সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো"। [সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত: ১৮৩]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله».

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল

এ সাক্ষ্য দান করা। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাদানের সাওম পালন করা। বায়তুল্লাহ শরীফের হজ করা”।[26]

হিজরী সনের দ্বিতীয় বর্ষে মুসলিম উম্মার ওপর রামাদানের সিয়াম পালন ফরয হয়েছে।

৩- সিয়াম পালনের ফযীলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিকমাত:

রামাদান মাস মহান আল্লাহর আনুগত্য করার বিরাট মৌসুম আর তা বান্দার নিকট একটি বিরাট নি‘আমত ও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট অনুগ্রহ। তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার প্রতি এর দ্বারা অনুগ্রহ করেন; যাতে তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি পায়, তাদের মান মর্যাদা বেড়ে যায় এবং তাদের অসৎকর্ম কমে যায়; যাতে তাদের সম্পর্ক তাদের মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে আরো শক্তিশালী হয়; যাতে তাদের জন্য লিখা হয় মহাপুরস্কার ও অধিক সাওয়াব; যাতে তারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তাঁর ভয়ে ও তাকওয়ায় তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

সাওমের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু নিম্নে বর্ণিত হলো,

(ক) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ

[26] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

“রামাদান মাস, যাতে বিশ্ব মানবের দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে সে যেন এ মাসের সিয়াম পালন করে। আর কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে বা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

(খ) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه»

“যে ব্যক্তি রামাদানের সিয়াম পালন করবে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তার পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হবে”।[27]

(গ) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزّ وجلّ: إلا الصوم،

[27] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك».

“প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, তবে সাওম ছাড়া। কারণ, সাওম হলো আমার জন্য আর আমি তার প্রতিদান প্রদান করবো। কারণ, সে শুধুমাত্র আমার জন্যই তার প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পানাহার বর্জন করেছে। সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ ইফতারের সময়, অপর আনন্দটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। আর সিয়াম পালনকারীর মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ আল্লাহর নিকট মেসকের সুগন্ধির চাইতেও অধিক উত্তম”।[28]

(ঘ) সিয়াম পালনকারীর দো‘আ কবুল করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ»

“নিশ্চয় সিয়াম পালনকারীর জন্য ইফতারের সময় একটি দো‘আ করার সুযোগ রয়েছে যা ফেরত দেওয়া হয় না।”[29]

তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ হবে তার ইফতারের সময়টাকে গণীমত মনে করে তার প্রভুর কাছে চাওয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে আগ্রহী হওয়া। হতে পারে সে মহান আল্লাহর সুগন্ধির কিছু সুগন্ধি পেয়ে যাবে। অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাতে তার সৌভাগ্যময় জীবন অর্জিত হবে।

---

[28] বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের।

[29] ইবন মাজাহ, এর সনদ দুর্বল। [সম্পাদক]

(ঙ) আল্লাহ জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা সিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ দরজা দিয়ে শুধু সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের সম্মানার্থে ও অন্যদের ওপর তাদের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করণার্থে।

সাহল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إن في الجنة باباً يقال له (الريان) فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد».

"নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম হলো রাইয়্যান। অতএব, যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সে দিন বলা হবে সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তাদের প্রবেশ শেষে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না"।[30]

(চ) কিয়ামত দিবসে সিয়াম পালনকারীর জন্য সিয়াম সুপারিশ করবে। আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته من الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان».

"সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আমার প্রভু ! আমি তাকে পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম

[30] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। আর কুরআন বলবে, রাতে আমি তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে”।[31]

(ছ) সিয়াম মুসলিম ব্যক্তিকে ধৈর্য, কষ্ট, সাধনা ও কোনো কাজ মনোযোগ সহকারে পালন করার শিক্ষা দেয় বা অভ্যাস গড়ে তুলে। আর সিয়াম পালনকারীকে তার প্রিয় ও প্রসিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করতে সাহায্য করে। আর তা অবাধ্য আত্মাকে বাধ্য করতেও সাহায্য করে, অথচ এতে বিরাট কষ্ট রয়েছে।

৪- সিয়াম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

সিয়াম পালন প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) আকেল (বিবেকবান) সহীহ (সুস্থ) মুকীম (অবস্থানকারী) মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয হওয়ার ওপর সকল আলিমগণ একমত হয়েছেন।

হায়েয ও নিফাসরত মহিলা ছাড়া অন্যান্য মহিলাদের ওপরও সিয়াম পালন ফরয।

৫- সিয়াম পালনের আদাবসমূহ:

(ক) গীবাত করা, চুগলখোরী করা এবং এ দু’টি ছাড়াও অন্যান্য কর্ম যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা থেকে সিয়াম পালনকারীর বিরত থাকা। তাই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর অপরিহার্য যে, সে তার জবানকে সকল হারাম কথাবার্তা থেকে ও অন্যদের চরিত্রতে আঘাত

[31] আহমদ।

হানা থেকে বিরত রাখবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

“যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও মিথ্যার প্রতি আমল করা ছেড়ে দিল না সে ব্যক্তির পানাহার ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই”।[32]

(খ) সিয়াম পালনকারী সাহরী খাওয়া ছাড়বে না। কারণ, তা তাকে তার সিয়াম পালনে সহযোগিতা করে। অতঃপর সে আরামে দিন অতিবাহিত করতে পারবে। কর্মচঞ্চলতা ও সজীবতার সাথে তার কর্ম আদায় করতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يخرج أحدكم جرعة من ماء فإن الله عزّ وجلّ وملائكته يصلون على المتسحرين».

“সাহরী বরকতের খাবার, তা ছেড়ে দিও না। যদিও তোমাদের কেউ এক ঢোক পানি পান দিয়েই তা সম্পন্ন করে, কারণ আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর ফিরিশতারা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীদের কথা আলোচনা করেন”।[33]

(গ) নিশ্চিতভাবে সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ইফতার করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر».

---

[32] সহীহ বুখারী।

[33] আহমদ।

“মানুষ যতক্ষণ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততক্ষণ তারা ভালো থাকবে”।[34]

(ঘ) রূত্বাব (অর্ধপক্ক খেজুর) বা খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করবে। কারণ, তা সুন্নাত। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كان رسول الله يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পূর্বে রূত্বাব দিয়ে ইফতার করতেন। আর রত্বাব না থাকলে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন আর খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন”।[35]

(ঙ) কুরআন পাঠ আল্লাহ তা‘আলার যিকির তাঁর প্রশংসা ও তাঁর শুকরিয়া, দান, দয়া, নফল ইবাদাত ও অন্যান্য সৎকাজ বেশি বেশি করা। কারণ, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«كان رسول الله أجود النّاس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের চাইতে অধিক দানশীল ছিলেন। রামাদান মাসে যখন তাঁর সাথে জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম রামাদানের

[34] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[35] আবূ দাউদ।

প্রতি রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন ও পরস্পর কুরআন পড়তেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন জিবরীল 'আলাইহিস সালাম সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি প্রবাহমান বায়ুর চাইতেও অধিক দানশীল হয়ে যেতেন"।[36]

৬- সিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

- দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। অনুরূপভাবে সকল সিয়াম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করা, যেমন খাদ্যের ইঞ্জেকশন বা মুখের সাহায্যে ঔষধ গ্রহণ। কারণ, তা পানাহারের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে অল্প রক্ত বের করা যেমন, পরীক্ষার জন্য বের করা, তা সিয়ামের কোনো ক্ষতি করবে না।

- রামাদান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা। কারণ, তা তার সাওমকে নষ্ট করে দিবে। রামাদান মাসের সম্মান নষ্ট করার কারণে তার ওপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। যে দিবসে সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে সে দিবসের সাওম কাযা করবে। তার ওপর কাফ্ফরা ফরয হবে। আর তা হলো, একজন দাস আজাদ করা আর এর সামর্থ্য না থাকলে ধারাবাহিক দু' মাসের সিয়াম পালন করা, এর সামর্থ্য না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। প্রতি মিসকীনকে গম বা অন্য কিছু যা শহরবাসীর নিকট খাদ্য হিসাবে গণ্য তা থেকে অর্ধ সা'আ প্রদান করা। কারণ, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন,

[36] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

«بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاء رجل، فقال: يارسول الله هلكت، قـال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقـال رسـول الله ﷺ هـل تجد رقبـة تعتقها؟ قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قـال: لا. قـال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال: لا. قال: فمكث النبي ﷺ فبينمـا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بفرق فيه تمر - والفرق المكتل، وقال أين السائل؟ فقـال: أنـا قال : خذ هذا فتصدق به, فقال الرجل : على أفقر مني يا رسـول الله، فوالله مـا بين لابتيها - يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك».

“একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ এক লোক আগমণ করলো, অতঃপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কী হয়েছে? সে বললো আমি সাওম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি একটি দাস আযাদ করতে পারবে? সে বললো, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি দু’মাস পর্যায়ক্রমে সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বললো, না। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি ষাট মিসকীনকে খানা খাওয়াতে পারবে? সে বললো, না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। আমরা এ অবস্থাতেই ছিলাম, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি ‘ফারাক্ব’ বা বস্তা নিয়ে আসা হলো

যাতে খেজুর ছিল। বস্তুতঃ ‘ফারাক্ব’ হচ্ছে নির্ধারিত পরিমাণের বস্তা। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? তারপর সে উত্তর দিল যে, আমি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো নিয়ে গিয়ে সাদকা করে দাও। সে ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়েও অধিক গরীবের ওপর, (সে বললো) আল্লাহর শপথ মদিনার এ দু’ ‘হাররা’ তথা ‘কালো পাথুরে ভুমি’র মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে দরিদ্র পরিবার আর নেই। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। এমনকি তার ছেদন দাঁত প্রকাশ হয়ে গেল। তারপর বললেন, (যাও) তা তোমার পরিবারকে খাওয়াও”।[37]

- চুমু, সহবাস বা হস্ত মৈথুনের মাধ্যমে বীর্য বের করা। সিয়াম পালনকারী যদি উল্লেখিত কারণসমূহের যে কোনো একটি কারণ দ্বারা বীর্য বের করে তবে তার সাওম বাতিল হয়ে যাবে, তা কাযা করা অপরিহার্য হয়ে যাবে, দিনের বাকী অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে। তার ওপর কাফফারা ধার্য হবে না। আর সে তাওবা করবে, লজ্জিত হবে, ক্ষমা চাইবে, কামভাব উত্তেজিত করে এমন সকল অপকর্ম থেকে দূরে থাকবে। যদি সিয়াম পালন অবস্থায় ঘুমের ঘরে স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হয়, তবে তার সিয়াম পালনের ওপর সেটার কোনো প্রভাব পড়বে না ও তার ওপর কোনো কিছু ধার্য হবে না। তবে তার ওপর গোসল করা অপরিহার্য হবে।

---

[37] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

□ পাকস্থলীতে বিদ্যমান বস্তু মুখ দিয়ে বের করে ইচ্ছাকৃত বমি করা। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় যদি কিছু বের হয়ে যায় তবে তা তার সিয়ামের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض».

“যার বমি হয়ে যাবে তার ওপর কাযা নেই। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করলো সে কাযা করবে”।[38]

□ হায়েয ও নিফাস দেখা দিলে। আর তা দিনের প্রথম অংশে হোক বা শেষাংশে সূর্য ডুবার পূর্ব মূহুর্তে হোক।

□ সিয়াম পালনকারীর জন্য সিঙ্গা লাগানো ছেড়ে দেওয়া উত্তম। যাতে তা তার সিয়াম নষ্টের কারণ না হয়। রক্ত দানের জন্য রক্ত বের না করা উত্তম। তবে অসুস্থ ও অনুরূপ ব্যক্তির সহযোগিতার তাগিদে রক্ত দান করলে অসুবিধা নেই। আর যদি নাক দিয়ে বা কাশির সাথে বা জখম হওয়ার কারণে বা দাঁত উঠানোর কারণে ও অনুরূপ কারণে রক্ত বের হয়, তবে তা তার সিয়ামের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

৭- সিয়ামের বা সাওমের সাধারণ বিধানসমূহ:

চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা ফরয প্রমাণিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

---

[38] আবূ দাউদ ও তিরমিযী।

“সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষীই যথেষ্ট। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«تـراىء النّـاس الهلال فـأخبرت رسـول الله أني رأيتـه فصـام وأمـر النّـاس بصيامه».

“মানুষ একে অপরে চাঁদ দেখছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে আমি চাঁদ দেখেছি। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করলেন ও মানুষদেরকে সিয়াম পালনের আদেশ দিলেন”।[39]

প্রত্যেক দেশে-দেশের রাজার হুকুম সিয়াম পালন শুরুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সে যদি সিয়াম পালনের আদেশ করে অথবা সিয়াম পালন করতে নিষেধ করে, তার আনুগত্য করা ফরয হবে। আর যদি দেশের রাজা কাফির হয়, তবে দেশে ইসলামী ঐক্য ঠিক রাখার জন্য ইসলামী সেন্টার বা অনুরূপ বোর্ডের বিধান কার্যকর হবে।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে দূরদর্শন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া জায়েয আছে। রামাদান শুরু বা শেষ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কক্ষ পথের হিসাবের ও তারকা দেখার ওপর ভরসা করা ঠিক নয়। কেবল চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করা হবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

[39] আবু দাউদ, দারেমী ও অন্যান্যরা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

“সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাদান মাসকে পাবে তার ওপর সে মাসের দিনগুলো তা ছোট হউক বা বড় হউক সিয়াম পালন করা ফরয হবে।

প্রত্যেক দেশে রামাদান মাসের সিয়াম পালন শুরু হওয়ার ব্যাপারে মানদণ্ড হলো তার চাঁদ উদিত হওয়ার স্থানে চাঁদ দেখা। আর তা ফকীহগণের অধিক গ্রহণযোগ্য মত। কারণ, চাঁদ উদিত হওয়ার স্থানসমূহ ভিন্ন, এর ওপর আলিমগণের ঐকমত্য রয়েছে। আর এটাই প্রমাণিত হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً».

“তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু কর। আবার চাঁদ দেখেই সিয়াম পালন ছেড়ে দাও। আর তোমরা যদি চাঁদ দেখতে না পাও তবে শা‘বান মাসকে ত্রিশ দিন পুর্ণ কর”।[40]

সিয়াম পালনকারীর রাতেই সিয়ামের নিয়াত করা আবশ্যক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

“কর্মের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি

40 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

যা নিয়াত করবে তাই তার জন্য অর্জিত হবে”।[41]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

“যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে সিয়াম পালনের নিয়াত করবে না তার সিয়াম পালন শুদ্ধ হবে না”।[42]

ওযরযুক্ত ব্যক্তি যেমন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি বা হায়েয বা নিফাসরত মহিলা বা গর্ভধারিণী বা বাচ্চাকে দুধ প্রদানকারিনী মহিলা ছাড়া কারো জন্য রামাদান মাসের সিয়াম পালন ছেড়ে দেওয়া বৈধ নয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ١٨٤﴾ [البقرة: ١٨٤]

“তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিবে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৪]

অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তি যার ওপর সিয়াম পালন কষ্টকর হবে, সিয়াম ভঙ্গকারী কারণসমূহ থেকে বিরত থাকা কঠিন হবে ও তার দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার জন্য রামাদান মাসের সিয়াম ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে। রামাদান মাসে যে কয় দিনের সিয়াম ছেড়ে দিয়েছিল রামাদানের পর সে কয় দিনের সিয়াম কাযা আদায় করবে।

---

41 সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

42 এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদীস থেকে।

অনুরূপভাবে যদি গর্ভধারিণী ও সন্তানকে দুগ্ধ প্রদানকারিনী শুধু নিজেদের কষ্টের আশংকা করে তবে সিয়াম ছেড়ে দিবে ও তাদের ওপর কাযা করা আবশ্যক হবে, এর ওপর আলিমগণের ইজমা রয়েছে। কারণ, তারা দু'জন প্রাণ নাশের আশংকা করে এমন অসুস্থ ব্যক্তির সমপর্যায়ে। আর যদি নিজেদের ও সন্তানের কষ্টের আশংকা করে বা শুধু সন্তানের কষ্টের আশংকা করে তবে তারা সিয়াম পালন ছেড়ে দিবে, তাদের ওপর কাযা আবশ্যক হবে। কারণ, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মারফু' হাদীস বর্ণনা করেছেন,

«إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع».

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের অর্ধেক সালাত, আর গর্ভধারিণী ও সন্তানকে দুগ্ধ প্রদানকারিনীর সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন"।[43]

তবে অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা তাদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। যদি সিয়াম পালন তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর হয়। তাদের ওপর প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো আবশ্যক হবে।

কারণ ইমাম বুখারী রহ. আতা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিম্নের আয়াত পাঠ করতে শুনেছেন,

﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ ١٨٤﴾ [البقرة: ١٨٤]

"আর যারা ওতে (সিয়াম পালনে) অক্ষম তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে বা খাওয়াবে"। [সূরা আল-বাকারাহ,

[43] নাসাঈ ও ইবন খুযাইমা হাদীসটি হাসান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আয়াত: ১৮৪]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«ليست منسـوخة هي للشـيخ الكبـير والمرأة الكبـيرة لا يسـتطيعان أن يصـوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».

“এ আয়াতটি রহিত নয়। বরং তা অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা যাদের সিয়াম পালনের সামর্থ্য নেই তাদের ব্যাপারে। তারা প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে”।

আর সফর বা ভ্রমণ হলো সিয়াম পালন ছেড়ে দেওয়ার গ্রহণযোগ্য কারণসমূহের একটি কারণ। কারণ, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

«كنا نسافر مع النبي ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم».

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতাম। সিয়াম পালনকারীরা সিয়াম ত্যাগকারীদের আর সিয়াম ত্যাগকারীরা সিয়াম পালনকারীদের দোষারোপ করতো না”।[44]

[44] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

পঞ্চম রুকন: হজ

১- হজের সংজ্ঞা:

হজের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা। আরবী ভাষায় বলা হয়, অমুকে আমাদের নিকট হজ করেছে। অর্থাৎ সে আমাদের নিকট আসার ইচ্ছা করেছে ও আমাদের নিকট এসেছে।

হজের পারিভাষিক অর্থ: নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদাত করার জন্য মাক্কায় গমণের ইচ্ছা করাকে হজ বলে।

২- হজের হুকুম:

সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর তার জীবনে একবার হজ ফরয হওয়া এবং তা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, যার ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, এ ব্যাপারে উম্মাত ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [ال عمران: ٩٧]

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন”। [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৯৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله».

“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা‘বুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দান করা। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। রামাদানের সিয়াম পালন করা। বায়তুল্লাহর হজ করা”।[45]

তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে আরো বলেন,

«يا أيها الناس إن الله فرض عليكم حج البيت فحجوا».

“হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের ওপর বায়তুল্লাহর হজ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ কর”।[46]

৩- হজের ফযীলত ও তা প্রবর্তনের পিছনে হিকমাত:

হজের ফযীলতে অনেক দলীল বর্ণিত হয়েছে:

তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ ٢٨﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨]

“এবং মানুষের নিকট হজ এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা

---

[45] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[46] সহীহ মুসলিম।

আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থান গুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকে যাহা রিযিক হিসাবে দান করেছেন উহার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারবে”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৭-২৮]

আর হজ সকল মুসলিমের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে অনেক কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। সুতরাং হজের মধ্যে নানা প্রকার ইবাদাতের সমাবেশ রয়েছে। যেমন,

□ কা‘বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ, আরাফাতে, মিনায়, মুদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, মিনায় রাত্রিযাপন, হাদী জবেহ, মাথার চুল মুণ্ডানো, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর কাছে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করার জন্য ও তাঁর দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য বেশি বেশি আল্লাহর যিকির। তাই হজ হলো পাপ মোচনের ও জান্নাতে প্রবেশের কারণসমূহের অন্যতম একটি কারণ।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«سمعت رسول الله □ يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ করলো আর সে নির্লজ্জ কোনো কথা বার্তা ও ফাসেকী কোনো কর্মে লিপ্ত হলো না সে তার পাপ থেকে ফিরে

আসলো সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল”।[47]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

“এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ এ দুইয়ের মাঝে কৃত পাপের কাফ্ফারা। আর গৃহীত হজের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত”।[48]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো কাজটি অতি উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। বলা হলো, তার পর কোনোটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। বলা হলো তারপর কোনটি? তিনি বললেন, গৃহীত হজ”।[49]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث

[47] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[48] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[49] বুখারী ও মুসলিম উভয়েই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة».

“তোমরা হজ ও উমরাহ পর্যায়ক্রমে করতে থাক। কারণ, এ দু’টি দরিদ্রতা দূর করে আর পাপ মোচন করে। যেমন, কর্মকারের হাপর লোহার, সোনা ও রূপার মরিচা দূর করে। আর গৃহীত হজের একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত”।[50]

- বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসলিমদের আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়স্থানে একে অপরের মিলন, পরস্পরের পরিচয় লাভ, কল্যাণ কর ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ ও তাদের কথা কাজ ও যিকির এক হওয়া হজের উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত।

- এতে তাদের আক্বীদায়, ইবাদাতে, উদ্দেশ্য ও ওয়াসিলাতে ঐক্যের ও একত্রিত হওয়ার প্রশিক্ষণ রয়েছে। আর তাদের এ একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের মাঝে পরস্পর পরিচয় লাভ হয়, বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় ও এক অপর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায় ও আল্লাহ তা‘আলার কথা বাস্তবায়িত হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে,

[50] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাসান ও সহীহ বলেছেন।

যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন”। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

৪- হজ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

(ক) হজ ফরয হয় পাঁচটি শর্তে এতে ফকীহগণের মতানৈক্য নেই। আর তা হলো:

ইসলাম বা মুসলিম হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, স্বাধীন হওয়া ও সামর্থ্য থাকা। তবে মহিলার ওপর হজ ফরয হওয়ার জন্য হজের সফরে তার সাথে মাহরাম থাকা আবশ্যক। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم».

“আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এমন মহিলার জন্য বিনা মাহরামে (বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ এমন পুরুষ) একদিনের দূরত্বের পথও সফর করা বৈধ নয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন”।[51]

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ শর্তগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথমত: হজ সহীহ ও ফরয হওয়ার জন্য শর্ত, আর তা হলো, ইসলাম ও বিবেকসম্পন্ন হওয়া, তাই কাফির ও পাগলের ওপর হজ ফরয নয়। তাদের পক্ষ থেকে হজ শুদ্ধও হবে না। কারণ, তারা

[51] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ইবাদাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত: যা ফরয ও যথেষ্ট হওয়ার জন্য শর্ত, আর তা হলো, প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হওয়া, তাদের হজ সহীহ হওয়ার শর্ত নয়। তাই যদি বাচ্চা ও দাস হজ করে, তবে তাদের হজ শুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের এ হজ ইসলামের ফরয হজ হিসেবে যথেষ্ট হবে না।

তৃতীয়ত: যা শুধু ফরয হওয়ার জন্য শর্ত, আর তা হলো, সামর্থ্যবান হওয়া। তবে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যদি কষ্ট করে হজ করে এবং যদি পাথেয় ও যানবাহন ছাড়াই হজে চলে যায়, তবে তার হজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

(খ) হজ আদায়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার বিধান

যে ব্যক্তি হজ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পূর্বে মারা যাবে, তার ওপর ফরয হবে না। এতে ফকীহগণের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি হজ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার পর মারা যাবে, তার ওপর হতে মৃত্যুর কারণে ফরয বাদ হয়ে যাবে কি হবে না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজের ফরয বাদ হয়ে যাবে না। বরং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের ওপর তার পক্ষ থেকে তার মাল দ্বারা হজ করানো অপরিহার্য হবে, সে তার পক্ষ থেকে হজ আদায়ের অসিয়াত করে যান আর না-ই যান। তা তার ওপর অন্যান্য ঋণের মতই একটি হিসেবে আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হবে। কারণ, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদীস বর্ণনা করেছেন। জনৈক মহিলা হজ করার মানত করে মারা যায়, অতঃপর তার ভাই নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قـال: نعم، قـال: فاقضـوا الله فهـو أحق بالوفاء».

“তোমার কী মত? যদি তোমার বোনের ওপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা আদায় করতে না? সে বললো, হ্যাঁ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ঋণ আদায় কর, কারণ আল্লাহর ঋণ আদায় করা আরও অধিক যুক্তিযুক্ত”।[52]

(গ) যে ব্যক্তি নিজে হজ করে নি সে অন্যের পক্ষ থেকে বদল হজ করতে পারবে কি?

যে ব্যক্তি প্রথমে নিজের হজ করে নি সে অন্যের পক্ষ থেকে বদল হজ করতে পারবে না। এটাই ফকীহগণের মতামতের মধ্য থেকে সঠিক মত। কারণ, এ ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে আর তা হলো,

«أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شـبرمة؟ قـال: أخ لي أو قريب لي، فقال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال لا. قـال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লাব্বাইক ‘আন শুবরুমাহ বলতে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, শুবরুমাহ কে? সে বললো, আমার ভাই বা আমার

[52] সুনান নাসাঈ।

নিকট আত্মীয়। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার হজ করেছ? সে বললো, না। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগে তুমি নিজের হজ কর, তারপর শুবরুমার হজ করবে”।[53]

সামর্থ্যহীন অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কেউ বদলি হজ আদায় করে তবে সঠিক মতে তা আদায় করা শুদ্ধ হবে। কারণ, এ ব্যাপারে ফযল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার একটি হাদীস রয়েছে, তাতে এসেছে,

«أن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع».

“খাছ‘আমা গোত্রের জনৈক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি যানবাহনে স্থির থাকতে পারেন না। তার ওপর আল্লাহর হজ ফরয হয়েছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে বদল হজ আদায় করতে পারবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তার পক্ষ থেকে বদল হজ কর। এ ঘটনা বিদায় হজে ঘটেছিল”।[54]

(ঘ) হজ অবিলম্বে ফরয না বিলম্বে ফরয?

হজ ফরয হওয়ার শর্ত পুরণ হওয়ার সাথে সাথেই হজ ফরয হবে,

[53] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাইহাকী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[54] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দগুলো সহীহ বুখারীর।

তা ফকীহগণের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহর ব্যাপক বাণী এসেছে। যেমন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহর অন্য বাণী হলো,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ١٩٦﴾ [البقرة: ١٩٦]

“আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরাহ পূর্ণ কর”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له».

“তোমরা ফরয হজের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা তোমাদের কেউই একথা জানে না যে, তার ভাগ্যে কি রয়েছে”।[55]

৫- হজের রুকনসমূহ:

হজের রুকন চারটি:

(ক) ইহরাম বাঁধা।

---

[55] হাদীসটি আবূ দাউদ, আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হাকেম হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

(খ) আরাফায় অবস্থান করা।

(গ) তাওয়াফুয যিয়ারা।

(ঘ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা।

আর এ চারটি রুকনের কোনো একটি রুকন ছুটে গেলে হজ পূর্ণ হবে না।

প্রথম রুকন: ইহরাম বাঁধা

ইহরামের সংজ্ঞা: ইহরাম হলো, ইবাদাতে প্রবেশের নিয়াত করা।

হজের মীকাত: হজের ইহরাম বাঁধার মীকাত দু' প্রকার:

(১) সময়ের মীকাত।

(২) স্থানের মীকাত।

সময়ের মীকাত: আর তা হলো,

হজের মাসসমূহ, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ ١٩٧﴾ [البقرة: ١٩٧]

"হজ হয় সুবিদিত মাসে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

আর তা হলো, শাওয়াল, যুলকা'দা ও যুলহাজ্জাহ।

স্থানের মীকাত: আর তা হলো, ঐ সীমাসমূহ যা হাজী সাহেবদের জন্য বিনা ইহরামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া বৈধ নয়। আর তা হলো পাঁচটি:

প্রথম: (যুলহুলাইফা) বর্তমানে এর নাম "আবারে আলী" তা মদিনাবাসীদের মীকাত, যা মক্কা থেকে (৩৩৬) কি. মি. অর্থাৎ ২২৪

মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয়: (আল-জুহফা) তা একটি গ্রাম, সে গ্রাম ও লোহিত সাগরের মাঝে দূরত্ব হলো (১০) কি. মি., যা মক্কা থেকে (১৮০) কি. মি. অর্থাৎ (১২০) মাইল দূরে অবস্থিত। আর তা মিসর, সিরীয়া, মরক্কো ও এদের পিছনে বসবাসকারী স্পেন, রূম ও তিক্রূরবাসীদের মীকাত। বর্তমানে মানুষ (রাবেগ) থেকে ইহরাম বাঁধে। কারণ, তা তার কিছুটা সমান দূরত্বে।

তৃতীয়: (ইয়ালামলাম) বর্তমানে তা (আসসা'দীয়া) নামে পরিচিত। আর তা তুহামাহ (সারিবদ্ধ) পর্বতসমূহের একটি পর্বত। যা মক্কা থেকে (৭২) কি. মি. অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। আর তা ইয়েমেন, আহলে জাওয়াহ, ভারতীয় উপমহাদেশের ও চীন বাসীদের মীকাত।

চতুর্থ: (ক্বারনুল মানাযেল) বর্তমানে এর নাম "আস-সাইলুল কাবীর" তা মক্কা থেকে (৭২) কি. মি. অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। আর তা নাজদ ও ত্বায়েফবাসীদের মীকাত।

পঞ্চম: (যাতে ইর্ক্ব) তা বর্তমানে (আয্যারীবাহ) নামে পরিচিত, এর নাম যাতে ইর্ক্ব রাখা হয়েছে। কারণ, তথায় ইর্ক্ব আছে। আর ইর্ক্ব হলো ছোট পর্বত। যা মক্কা থেকে (৭২) কি. মি. অর্থাৎ (৪৮) মাইল দূরে অবস্থিত। তা প্রাচ্যবাসীদের, ইরাক্ব ও ইরানবাসীদের মীকাত।

এ হচ্ছে স্থানের মীকাত– এ নির্ধারিত সীমাসমূহ বিনা ইহরামে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাওয়া কোনো হজ ও উমরাহকারীর জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়।

এ মীকাতগুলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন। যেমন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«وقت رسول الله-ﷺ-لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা। আর সিরীয়াবাসীদের জন্য আল-জুহফাহ। আর নাজদবাসীদের জন্য ক্বারনুল মানাযেল। ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নির্ধারণ করেছেন। ঐ মীকাতগুলো ঐ এলাকাবাসীদের জন্য। আর যারা হজ ও উমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে পৌঁছবে, তাদের জন্যও মীকাত নির্ধারিত হলো। আর যারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করে তাদের ইহরাম বাঁধার স্থান হবে তাদের নিজস্ব অবস্থানস্থল, এমনকি মক্কার লোক মক্কাতেই ইহরাম বাঁধবে"।[56]

সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে,

«مهل أهل العراق ذات عرق».

"ইরাক্বাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান হলো যাতেইর্ক"।[57]

যে ব্যক্তি ঐ মীকাতসমূহের কোনো একটি মীকাত দিয়ে অতিক্রম

[56] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[57] সহীহ মুসলিম।

করবে না, সে ঐ সময় ইহরাম বাঁধবে যখন সে জানতে পারবে যে, সে ঐ মীকাতসমূহের একটি মীকাতের বরাবর হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আকাশ পথে বিমানে আরোহণ করবে সে ঐ মীকাতসমূহের যে কোনো একটি মীকাতের নিকটবর্তী হলে ইহরাম বাঁধবে। বিমানে আরোহী ব্যক্তির জন্য জিদ্দা এয়ার পোর্টে নেমে ইহরাম বাঁধা ঠিক হবে না, যেমনটি কিছু হাজী সাহেবগণ করে থাকেন।

কারণ জিদ্দা শুধু জিদ্দাবাসীদের মীকাত বা জিদ্দা তাদের জন্য মীকাত যারা জিদ্দায় অবস্থানকালে হজ ও উমরার নিয়াত করবে।

তাই জিদ্দাবাসী ছাড়া যে কেউ জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধলো সে হজের একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করলো। তা হলো মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। এর কারণে তার ওপর একটি ফিদইয়া অপরিহার্য হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করবে তার কর্তব্য হবে মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসা। সে যদি তথায় ফিরে না যায় বরং যে স্থানে পৌঁছেছে সে স্থান থেকেই ইহরাম বেঁধে নেয়, তবে তার ওপরও একটি ফিদইয়া প্রদান করা অপরিহার্য হবে। আর তা হলো একটি ছাগল যবেহ করা, বা উট ও গরুর এক সপ্তাংশে অংশীদার হয়ে যবেহ করা আর তা হারামের মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা, তা থেকে কিছু ভক্ষণ না করা।

হজ আদায়ের পদ্ধতি: ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, চুলের যা কর্তন করা বৈধ তা কর্তন করে শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া মুস্তাহাব। পুরুষলোক সিলাইযুক্ত কাপড় খুলে ফেলবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা দু’টি-লুঙ্গী ও

চাদর পরিধান করবে। বিশুদ্ধ মতে ইহরামের জন্য কোনো বিশেষ সালাত নেই, তবে ইহরাম বাঁধাটা যদি কোনো ফরয সালাতের সময়ে হয়, তবে ফরয সালাতের পর ইহরাম বাঁধবে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাতের পর ইহরাম বেঁধেছিলেন।

অতঃপর তিন প্রকার হজ: তামাত্তু‘, ক্বিরান, ইফরাদ যেটার ইচ্ছা করবে সেটার ইহরাম বাঁধবে।

- **তামাত্তু‘ হজের সংজ্ঞা:** হজের মাসে উমরার ইহরাম বেঁধে তা পুরা করে ঐ সফরেই হজের ইহরাম বাঁধা হলো তামাত্তু‘ হজ।
- **ক্বিরান হজের সংজ্ঞা:** হজ ও উমরার এক সাথে ইহরাম বাঁধা, অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধা, পরে উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হজকে উমরার সাথে জড়িত করে নেওয়াই ক্বিরান হজ। অতঃপর মীকাত থেকে হজ ও উমরা উভয়ের নিয়াত করবে বা উমরার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হজ ও উমরা উভয়ের নিয়াত করবে। তারপর হজ ও উমরা উভয়ের তাওয়াফ ও সা‘ঈ করবে।
- **ইফরাদ হজের সংজ্ঞা:** মীকাত থেকে শুধু হজের ইহরাম বাঁধা ও হজের সকল কর্ম সম্পাদন করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা হলো ইফরাদ হজ।

মাসজিদে হারামের অধিবাসী নয় এমন-তামাত্তু‘ ও ক্বিরানকারীর ওপর হাদি যবাই করা অপরিহার্য। তিন প্রকার হজের কোনোটি উত্তম এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে ফকীহগণের মধ্যে কিছু কিছু বড় মুহাক্কিকের নিকট তামাত্তু‘ হজ উত্তম।

তারপর যখন এ তিন প্রকার হজের যে কোনো একটি হজের ইহরাম বাঁধবে, তখন ইহরামের পর লাব্বাইক বলবে,

«لبيك اللّٰهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

উচ্চারণ: লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা-শারীকা লাকা।

তালবীয়াহ বেশি বেশি পাঠ করবে। পুরুষ লোক উচ্চ-শব্দে পাঠ করবে।

ইহরামের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ:

আর তা হলো ইহরাম বাঁধার কারণে মুহরিম ব্যক্তির ওপর যা সম্পাদন করা হারাম, তা সর্বমোট নয়টি:

এক: চুল মুণ্ডানো বা অন্য কিছুর মাধ্যমে সমস্ত শরীর থেকে চুল উঠানো। কারণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো,

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ ١٩٦﴾ [البقرة: ١٩٦]

“যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুণ্ডন করিও না”। [সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১৯৬]

দুই: বিনা ওযরে নখ কাটা। কারণ, এর দ্বারা চাকচিক্য অর্জিত হয় তাই তা চুল উঠানোর সাদৃশ্যে পরিণত হয়। তবে ওযর থাকলে নখ কাটা জায়েয হবে। যেমন, ওযরের কারণে চুল হাল্কা করে কাটা বা

মাথা মুণ্ডানো জায়েয।

তিন: মাথা ঢাকা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মুহরিমের মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন যে মুহরিমকে তার উট পা দিয়ে পিষে দিয়েছিল, তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».

"তার মাথা ঢাকিও না। কারণ, কিয়ামাত দিবসে তাকে তালবীয়াহ পাঠ করা অবস্থায় উঠানো হবে"।[58]

আর ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলতেন,

«إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها».

"পুরুষের ইহরাম হলো তার মাথায়, আর মহিলাদের ইহরাম হলো তার চেহারায় বা মুখে"।[59]

চার: পুরুষের সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা ও মোজা পরিধান করা। কারণ, আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

«سئل رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسّه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».

58 এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বরাতে বর্ণনা করেছেন।

৫৯ ইমাম বাইহাকী এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহরিম ব্যক্তি কী পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেন, মুহরিম ব্যক্তি কুর্তা, পাগড়ী, বুরনুস (এমন পোষাক যা সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে রাখে), পায়জামা পরিধান করবে না, ওয়ারস ও যাফরান যুক্ত কাপড়ও পরিধান করবে না, মোজাও পরিধান করবে না। তবে যদি সে জুতা না পায় তাহলে মোজা পায়ের গিরার উপরিভাগ কর্তন করে পরিধান করবে, যাতে মোজা পায়ের গিরার নিচে থাকে”।[60]

পাঁচ: সুগন্ধি ব্যবহার করা।

«لأن النبي ﷺ أمر رجلا في حديث صفوان بن أمية بغسل الطيب».

“কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান ইবন ই‘লা ইবন উমাইয়াহ এর হাদীসে এক ব্যক্তিকে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন”।[61]

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মুহরিম ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন যাকে তার উট পা দিয়ে পিষে দিয়েছিল,

«لا تحنطوه».

“তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগিও না”।[62]

সহীহ মুসলিমে আছে,

---

60 সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

61 এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

62 হাদীসটি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বরাতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

«ولا تمسوه بطيب»

“তাকে সুগন্ধি দ্বারা স্পর্শ করিও না।”[63]

মুহরিমের জন্য তার ইহরাম বাঁধার পর শরীরে বা শরীরের কোনো অংশে সুগন্ধি লাগানো হারাম। পূর্ব বর্ণিত ইবন উমারের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

ছয়: স্থলচর প্রাণী হত্যা করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে রয়েছে,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ٩٥﴾ [المائدة: ٩٥]

“হে মুমিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু বধ করবে না”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

আর তা শিকার করাও হারাম, যদিও তা হত্যা বা জখম না হয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার বাণী রয়েছে:

﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ ٩٦﴾ [المائدة: ٩٦]

“এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের (কোনো প্রাণী) শিকার তোমাদের জন্য হারাম”। [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৬]

সাত: বিবাহ করা। মুহরিম নিজে বিবাহ করবে না ও নিজের অভিভাবকতায় ও প্রতিনিধিত্বে অপরকে বিবাহ করাবে না, কারণ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফু‘ হাদীসে এসেছে,

[63] সহীহ মুসলিম।

«لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب».

"মুহরিম নিজে বিবাহ করবে না অপরকে বিবাহ করাবে না ও বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না"।[64]

আট: লজ্জাস্থানে সহবাস করা। কারণ, আল্লাহর বাণী রয়েছে,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ ١٩٧﴾ [البقرة: ١٩٧]

"অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলিতে হজ করা স্থির করে সে যেন কোনো গর্হিতকাজ না করে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তা (রাফাস) হলো সহবাস করা। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ ١٨٧﴾ [البقرة: ١٨٧]

"সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হইয়াছে"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭] উদ্দেশ্য হলো সহবাস করা।

নয়: যৌন আকর্ষণের সাথে নারীদের শরীরে শরীর লাগানো বা চুমু দেওয়া বা স্পর্শ করা। অনুরূপভাবে যৌন আকর্ষণের সাথে তাকানো। কারণ, তা হারাম সহবাসের দিকে পৌঁছে দেয়। সুতরাং তা হারাম।

এ নিষিদ্ধ কাজে মহিলারা পুরুষদের ন্যায়। তবে মহিলারা বিশেষ কিছু কর্মে পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র। যেমন, মহিলার ইহরাম হলো তার মুখে। তাই মহিলাদের জন্য বোরকা, নিকাব, বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা তাদের মুখ ঢাকা হারাম।

[64] এ হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মহিলাদের জন্য হাত মোজা পরিধান করাও হারাম। কারণ, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মারফু‘ হাদীসে এসেছে,

«ولا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين».

“মুহরিম মেয়েরা নিকাব পরিধান করবে না, হাত মোজাও পরিধান করবে না”।[65]

অনুরূপভাবে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«إحرام المرأة في وجهها».

“মহিলার ইহরাম হলো তার মুখে”।[66]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه».

“যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজে হজযাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পাশ দিয়ে কাফেলা অতিক্রম করতো। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো তখন আমরা মাথা থেকে চাদর চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিতাম। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা মুখের উপর থেকে কাপড় তুলে দিতাম”।[67]

---

[65] হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

[66] হাদীসটি বাইহাকী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

[67] এ হাদীসটি আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান।

পুরুষের জন্য যেমন চুল উঠানো, নখ কাটা, জানোয়ার হত্যা করা ইত্যাদি হারাম তা মহিলাদের জন্যও হারাম, কারণ তারা সাধারণ ব্যাপক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। তবে তারা সেলাইযুক্ত কাপড়, পায়ে মোজা পরিধান করতে পারবে ও তারা মাথা ঢাকতে পারবে।

দ্বিতীয় রুকন: ‘আরাফায় অবস্থান। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الحج عرفة».

“আরাফার অবস্থানই হজ”।[68]

তৃতীয় রুকন: তাওয়াফুল ইফাযা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج : ٢٩]

“এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের”। [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৯]

চতুর্থ রুকন: সা‘ঈ করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي».

“তোমরা সা‘ঈ কর, কারণ, আল্লাহ তোমাদের ওপর সা‘ঈ লিখে দিয়েছেন”।[69]

৬- হজের ওয়াজিবসমূহ:

হজের সর্বমোট ওয়াজিব সাতটি:

---

68 হাদীসটি আহমাদ ও আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেছেন।

69 হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

(১) মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফায় অবস্থান করা, তা তাদের জন্য যারা দিনের বেলায় ‘আরাফায় অবস্থান করবে।

(৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন।

(৪) আইয়্যামে তাশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ই যুলহাজ্জাহর) রাত্রিগুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

(৫) জামরাগুলোতে কঙ্কর মারা।

(৬) মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা।

(৭) তাওয়াফুল বি‘দা করা।

৭- হজের বর্ণনা:

হজ আদায়ের ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তির জন্য ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করা সুন্নাত। নিজ শরীরে যেমন তার মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। সাদা লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করা সুন্নাত। মহিলা সৌন্দর্য প্রকাশ করে এমন পোষাক ছাড়া যে কোনো পোষাক পরিধান করতে পারবে।

তারপর মীকাতে পোঁছে (ইহরাম বাঁধার সময়) ফরয সালাতের সময় হলে তা আদায় করবে ও তারপর ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম বাঁধার সময় ফরয সালাতের সময় না হলে দু’ রাকাত সালাত আদায় করবে, অযুর সুন্নাতের নিয়াতে ইহরামের সুন্নাতের নিয়াতে নয়। ইহরামের জন্য সুন্নাত সালাত রয়েছে একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণ হয় নি। আর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে তখন হজে প্রবেশের নিয়াত করবে। সুতরাং তামাত্তু‘ হজকারী হলে বলবে,

«لبيك اللَّهُمَّ عمرة»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান)।

আর হজে ইফরাদকারী বলবে,

«لبيك اللَّهُمَّ حجاً»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান)।

আর হজে ক্বিরানকারী বলবে,

«لبيك اللَّهُمَّ حجاً في عمرة»

(লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান ফি উমরাতিন)। পুরুষ ব্যক্তি জোরে বলবে মহিলারা চুপে চুপে বলবে আর বেশি বেশি তালবীয়াহ পাঠ করবে। যখন মক্কায় পৌঁছবে তখন তাওয়াফ শুরু করবে, হাজারে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। আল্লাহর ঘরকে তার বাম দিকে রাখবে। হাজারে আসওয়াদকে লক্ষ্য করবে। তাকে চুমু দিবে বা তাকে স্পর্শ করবে বিনা ভিড়ে যদি সম্ভব হয় তবে তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। অন্যথায় তার দিকে ইশারা করবে ও তাকবীর দিবে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলবে আর বলবে,

«اللَّهُمَّ ايماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك ﷺ».

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ইত্তেবাআন লিসুন্নাতে নবীইয়েকা।

অর্থাৎ “হে আল্লাহ, আপনার ওপর ঈমান এনে, আপনার কিতাবের ওপর বিশ্বাস করে, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণার্থে এবং

আপনার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আনুগত্য করতে গিয়ে আমি তা শুরু করছি"।

আর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। আর যখন রুকনে ইয়ামানীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তাকে চুমু ছাড়াই হাত দিয়ে স্পর্শ করবে।

রামল করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর রামল হলো, তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন শাওত্বে বা প্রথম তিন চক্করে ঘন ঘন পা রেখে দ্রুত চলা।

কারণ, ইবন উমার থেকে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দ্রুত চলতেন আর বাকী চার চক্করে সাধারণভাবে চলতেন।

ইযতিবা করাও তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। ইযতিবা হলো, ইহরাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্য ভাগকে ডান কাঁধের নিচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের ওপর ধারণ করা। কারণ, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

«اضطبع رسول الله هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ ইযতিবা করেছেন ও তিন চক্করে রামল করেছেন।

আর ইযতিবা শুধুমাত্র সাত চক্কর তাওয়াফে সুন্নাত। এর আগে বা পরে সুন্নাত নয়।

বিনয়ের সাথে ও আন্তরিকভাবে নিজের নিকট যে সকল দো‘আ পছন্দনীয় সে সকল দো‘আ তাওয়াফ করার সময়ে পড়বে।

রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে বলবে,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

উচ্চারণ: রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আযাবান নার।

“হে আমাদের রব! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

প্রতি চক্করে নির্ধারিত দো‘আর প্রচলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, বরং তা বিদ‘আত, ইসলামে নতুন কাজ।

আর তাওয়াফ তিন প্রকার: তাওয়াফে ইফাযাহ, তাওয়াফে কুদূম ও তাওয়াফে বিদা‘। প্রথমটি রুকন, দ্বিতীয়টি সুন্নাত এবং তৃতীয়টি বিশুদ্ধমতে ওয়াজিব।

তাওয়াফ শেষান্তে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে দু’ রাকাত সালাত পড়বে। মাক্বামে ইবরাহীম থেকে দূরে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই। প্রথম রাকাতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা আল-কাফিরুন

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١﴾ [الكافرون: ١]

এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-ফাতিহার পর সূরা ইখলাস

﴿ قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾ [الاخلاص: ١]

পড়বে। এ দু’ রাকাত সালাত হালকা হওয়া সুন্নাত। হাদীসে এভাবেই এসেছে। তারপর সাফা ও মারওয়াতে সাত চক্কর সা‘ঈ করবে। আর সা‘ঈ সাফা থেকে শুরু হবে, মারওয়াতে শেষ হবে। সাফা পাহাড়ে উঠতে নিম্নের আয়াত পাঠ করা সুন্নাত।

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝١٥٨ ﴾ [البقرة: ١٥٨]

উচ্চারণ: ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ ফামান্ হা্জ্জাল বাইতা আবি‘তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আই-ইয়াত্তাওফা বিহিমা ওয়ামান তা-তাওয়া‘ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শা-কিরুন আলীম।

“সাফা ও মারওয়া, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা‘বা গৃহের হজ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করে তার জন্যে এ দুইটির তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করলে তার কোনো পাপ নেই, এবং কেউ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞ”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮]

أبدأ بما بدأ الله به

“আল্লাহ যা দ্বারা শুরু করেছেন, আমিও তা দ্বারা শুরু করলাম”।

তারপর সাফা পর্বতে উঠবে। হস্তদ্বয় উত্তোলন করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর একত্বতা বর্ণনা করবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে,

তাঁর প্রশংসা করবে ও বলবে,

«الله أكبر، الله أكـبر، الله أكـبر، لا إله إلا الله وحـده لا شريك له، له الملـك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعــده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده».

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওলাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়ায়ামুতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওআ'দাহু ওয়ানাসারা আবদাহু, ওয়াহাযামা আল-আহযাবা ওয়াহদাহু।

তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য দো'আ করবে। আর এ দো'আ তিনবার করে পাঠ করবে। তারপর মারওয়ার দিকে যাবে, দুই সবুজ চিহ্নের মাঝে পুরুষের জন্য সম্ভব হলে দ্রুত চলা সুন্নাত। তবে কাউকে কষ্ট দিবে না। মারওয়াতে পৌঁছে তার ওপর উঠবে, ক্বিবলামুখী হবে, তারপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে, সাফাতে যা পাঠ করেছিল অনুরূপ মারওয়াতে তাই পাঠ করবে। সা'ঈ করাকালীন নিম্নের দো'আটি পাঠ করা উত্তম।

«رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم»

উচ্চারণ: রাবি্বগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আ'য়ায্যুল আক্রাম।

কারণ, ইবন উমার ও ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সা'ঈতে এ দো'আটি পড়তেন। অযু অবস্থায় সা'ঈ করা মুস্তাহাব, কেউ যদি বিনা অযুতে সা'ঈ করে নেয়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। ঋতুবর্তী

মহিলা যদি সা'ঈ করে নেয়, তবে তাও তার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ, সা'ঈতে অযু শর্ত নয়।

আর সে তামাত্তু' হজকারী হলে সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করবে। মহিলা তার চুল থেকে এক আঙ্গুলের মাথার পরিমাণ ছোট করবে।

আর যদি সে ক্বিরান বা ইফরাদ হজকারী হয় তবে সে (ইয়াওমুন নাহার)-কুরবানীর দিন যুলহাজ মাসের দশ তারিখে জামারাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে।

যুলহাজ মাসের আট তারিখে "তারবীয়ার দিবসে" সূর্য উদয়ের কিছু পরে তামাত্তু' হজকারী নিজ বাসস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। মাক্কাবাসীদের যে ব্যক্তি হজ করতে ইচ্ছা করবে সেও অনুরূপ করবে।

ইহরাম বাঁধা সময়ে গোসল করবে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবে ও অন্যান্য কাজ করবে। ইহরাম বাঁধার জন্য মাসজিদে হারামে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি। আমাদের জানা মতে তিনি তাঁর কোনো সাহাবীকে এর আদেশও দেন নি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন,

«أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج».

“তোমরা হালাল অবস্থায় থাক। তারপর তারবীয়ার দিবসে হজের ইহরাম বাঁধ।”

সহীহ মুসলিমে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أمرنا رسول الله ﷺ لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح»

“যখন আমরা মিনার দিকে রওনা হলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইহরাম বাঁধার আদেশ দিলেন, তখন আমরা আল-আবত্বাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধলাম।

তামাত্তু‘ হজকারী তার হজের ইহরাম বাঁধার সময় «لبيك حجاً» ‘লাব্বাইক হাজ্জান’ বলবে।

আর মুস্তাহাব হচ্ছে, মিনার দিকে বের হয়ে যাওয়া ও সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত পৃথক পৃথকভাবে স্ব স্ব ওয়াক্তে কসর করে আদায় করা। তথায় আরাফার রাত্রি যাপন করাও তার জন্য মুস্তাহাব।

কারণ, তা সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে আছে।

তারপর আরাফার দিবসের (যুলহাজ মাসের নয় তারিখের) সূর্য উদিত হলে আরাফায় যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সম্ভব হলে নামেরায় অবস্থান করা তার জন্য মুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। আর কারো জন্য যদি নামেরায় অবস্থান সম্ভব না হয় আর সে ‘আরাফায় অবস্থান করে

তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যোহর, আসরের সালাত এক আযান দু’ ইকামাতে একত্রিতভাবে দু’রাকা‘আত দু’ রাকাত করে পড়বে। তারপর মাওকিফ-‘আরাফা অর্থাৎ ‘আরাফার অবস্থানস্থলে অবস্থান করবে। সম্ভব হলে জাবালে রাহমাতকে তার ও ক্বিবলার মাঝে রাখা উত্তম। অন্যথায় পাহাড়মুখী না হলেও ক্বিবলামুখী হবে হস্তদ্বয় উত্তোলন অবস্থায় আল্লাহর যিকিরে, বিনয়তা প্রকাশে, দো‘আয় ও কুরআন তিলাওয়াতে পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব।

কারণ উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন,

«كنت رديف النبي ﷺ بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى».

“আমি ‘আরাফার মাঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এক সাওয়ারীতে ছিলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দো‘আ করতে লাগলেন, তাঁর উটনি তাঁকে নিয়ে একটু কাত হয়ে গেল ও তার লাগাম পড়ে গেল, তারপর তাঁর এক হাত দিয়ে তা উঠিয়ে নিলেন আর তাঁর অপর হাতটি উত্তোলন অবস্থায় ছিল”।[70]

আর সহীহ মুসলিমে আছে,

«لم يزل واقفاً يدعو حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة»

“সূর্য অস্তমিত হওয়া ও পশ্চিম আকাশে হলোদে রং দূরিভুত হওয়া

[70] হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দো'আ করছিলেন।

আরাফা দিবসের দো'আ সর্বোত্তম দো'আ। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

"সর্বোত্তম দো'আ হলো আরাফা দিবসের দো'আ। আমি ও আমার পূর্বের নবীগণের পঠিত উত্তম দো'আ হলো,

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

"একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত হক্ব কোনো মা'বুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব, তাঁর জন্যই সকল হামদ, আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান"।[71]

আর এ দো'আতে আল্লাহর নিকট তার অভাব, প্রয়োজন ও বিনয়তা প্রকাশ করা তার ওপর অপরিহার্য।

আর সে এ সূবর্ণ সুযোগ কোনোভাবেই নষ্ট করবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء».

[71] হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

“আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিবসে সব চেয়ে বেশি তাঁর বাঁন্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেন, তারা কি চায়?”[72]

আর ‘আরাফায় অবস্থান হওয়া হজের রুকন। সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। হাজী সাহেবদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, নিশ্চিতভাবে ‘আরাফার সীমান্তের ভিতর অবস্থান করা। কারণ, অনেক হাজী সাহেবরা এর প্রতি গুরুত্ব দেন না, ফলে তারা ‘আরাফা সীমান্তের বাইরে অবস্থান করেন। তাই তাদের হজ হয় না। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ধীর-স্থির ও শান্তিপূর্ণভাবে মুযদালিফার দিকে রওনা হবে।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أيها الناس السكينة السكينة».

“হে লোকসকল! তোমরা ধীর-স্থিরতা গ্রহণ কর, তোমরা ধীর-স্থিরতা গ্রহণ কর”।[73]

তারপর তথায় পৌঁছার পর মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করবে। মাগরিবের তিন রাকাত সালাত পড়বে আর ঈশার দু’ রাকাত সালাত পড়বে জম‘য়ে তা‘খীর (দেরী করে দু’ সালাত একত্রিত) করে।

হাজীদের জন্য মুযদালিফায় মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করা সুন্নাত। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে

[72] হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[73] হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

মাগরিব ও ইশার সালাত পড়েছেন। আর যদি ঈশার সালাতের সময় চলে যাওয়ার আশংকা করে তবে তা যে কোনো স্থানে পড়ে নিবে।

আর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করবে। সালাত ও অন্য কোনো ইবাদাত করে রাত্রি কাটাবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি। ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

«أن النبي أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع حتى طلع الفجر»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং সেখানে মাগরিব ও ইশার সালাত এক আযান দু’ ইকামতে আদায় করলেন, এ দু’য়ের মাঝে কোনো সুন্নাত পড়েন নি। তারপর ফজর হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থেকেছেন”।

জামরাতুল ‘আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য অর্ধ রাত্রি ও চন্দ্র ডুবে যাওয়ার পর ওযরগ্রস্ত ও দুর্বল ব্যক্তির জন্য মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়া জায়েয আছে। আর যারা দুর্বল নয় ও দুর্বলের সহযোগিতাতেও নয় এমন ব্যক্তিরা ফজর হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে থাকবে। আরাম করার জন্য প্রথম রাত্রে কঙ্কর নিক্ষেপ করার প্রতিযোগিতা যা আজকাল অধিকাংশ মানুষ করে থাকে, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাজী সাহেব মুযদালিফায় ফজর সালাত পড়ে আল-মাশ‘আরুল হারামে অবস্থান করবে। কিবলামুখী হয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করে

পূর্বাকাশ পুরোপুরি ফর্শা হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি আল্লাহকে আহ্বান করবে।

মুযদালিফার যে কোনো স্থানে অবস্থান করলেই তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রয়েছে,

«وقفت ها هنا وجمع كلها موقف» [رواه مسلم] و«جمع» هي مزدلفة.

“আমি এখানে অবস্থান করলাম, তবে জাম‘ তথা মুযদালিফা সম্পূর্ণটাই অবস্থান স্থল। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসে বর্ণিত ‘জাম‘ অর্থ মুযদালিফা”।

তারপর হাজী সাহেব কুরবানীর দিবসে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই মিনায় চলে আসবে ও জামরাতুল ‘আকাবায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। জামরাতুল ‘আকাবা হলো বড় জামরা যা মক্কার নিকটবর্তী। আর প্রতিটি কঙ্কর ছোলা বুটের চেয়ে একটু বড় হতে হবে। চতুর্দিক থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয হওয়ার ওপর সকল আলিমগণ একমত হয়েছেন। তবে কা‘বাকে তার বাম পাশে আর মিনাকে তার ডান পাশে রেখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা উত্তম। কারণ, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে,

«أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة».

“তিনি যখন বড় জামরার নিকটে পৌঁছলেন, তখন কা‘বাকে তাঁর বাম পাশে আর মিনাকে তাঁর ডান পাশে রাখলেন ও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, যার ওপর সূরা আল-বাকারাহ অবতীর্ণ

হয়েছিল তিনি এভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন”।[74]

বড় কঙ্কর, মোজা ও জুতা নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। হাজী সাহেব জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় তালবীয়াহ পাঠ ছেড়ে দিবে।

হাজী সাহেবদের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, ধারাবাহিকভাবে আগে কঙ্কর মারা, তারপর সে তামাত্তু‘ বা কিরান হজকারী হলে হাদি জবেহ করা, তারপর চুল কামিয়ে ফেলা বা চুল ছোট করা। তবে পুরুষের জন্য চুল কামিয়ে ফেলা উত্তম। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার রাহমাত ও মাগফিরাতের দো‘আ করেছেন। আর চুল ছোটকারীদের জন্য মাত্র একবার দো‘আ করেছেন। যেমন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তারপর হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাদাহ বা হজ্জের বড় তাওয়াফ করার জন্য বাইতুল্লাহতে যাবেন।

আর এটাই জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাতে এসেছে,

«أن النبي ﷺ أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصي الحذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জামরাটি গাছের নিকটে ছিল

[74] বুখারী ও মুসলিম উভয়েই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তার কাছে আসলেন ও তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন আর প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপকালে “আল্লাহু আকবার” বললেন। কঙ্কর ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির মত-বা সমান হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাত্বনুল ওয়াদী থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর মিনায় গেলেন ও উটের নাহর করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ শরীফে এসে পৌঁছালেন ও সেখানে যোহরের সালাত আদায় করলেন”।

কোনো হাজী সাহেব যদি এ চারটি ইবাদাতের কোনো একটি ইবাদাতকে অন্য কোনো একটি ইবাদাতের আগে করে ফেলে তাতে তার ওপর কোনো দোষ বর্তাবে না। কারণ, বিদায় হজের ব্যাপারে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে,

«وقف رسول الله والناس يسألونه، قال: فما سئل رسول الله يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমতাবস্থায় যে মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিন কোনো কিছুকে আগে করে ফেলেছে বা পরে নিয়ে গেছে এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু বলতেন, কর, কোনো ক্ষতি নেই”।

হাজী সাহেব যদি তামাত্তু‘ হজকারী হন তাহলে তাওয়াফে ইফাদার পর সা‘ঈ করবেন। কারণ, তার প্রথম সা‘ঈ উমরার জন্য ছিল।

সুতরাং তার ওপর হজের সা‘ঈ অপরিহার্য হবে। আর যদি সে ইফরাদ বা কিরান হজকারী হন ও তাওয়াফে কুদূমের পর সা‘ঈ করে নেন তাহলে দ্বিতীয় বার আর সা‘ঈ করবেন না। কারণ, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে,

«لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়াতে একবার সা‘ঈ করেছেন প্রথম সা‘ঈ”।[75]

যারা মিনায় অবস্থানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে না তাদের জন্য আইয়্যামুত তাশরীক যুলহজ মাসের (এগার, বার ও তের) তারিখ কঙ্কর মারার দিন ধরা হবে। আর যারা তাড়াতাড়ী করবেন তারা দু’ দিন যুলহজ মাসের এগার ও বার তারিখ কঙ্কর মারবেন। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার বাণী রয়েছে”

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

“তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ী করে দু’ দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই, আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো পাপ নেই। তা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

১১ ও ১২ তারিখ হাজীসাহেব প্রথম জামরা (ছোট) যা মসজিদে

[75] এ হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

খাইফের নিকটে তাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর মধ্যে জামরাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তারপর জামরাতুল আকাবাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপ কালে "আল্লাহু আকবার" বলবে। (ছোট) জামরাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে, জামরাকে বাম পাশে রেখে অনেকক্ষণ ধরে লম্বা দো'আ করা সুন্নাত। দ্বিতীয় জামরাতেও কঙ্কর মেরে ক্বিবলামুখী হয়ে দাড়ানো ও জামরাকে ব্যক্তির ডান পাশে রেখে লম্বা দো'আ করা সুন্নাত। কিন্তু বড় জামরাতে কঙ্কর মারার পর লম্বা দো'আ করা কিংবা দাঁড়ানো সুন্নাত নয়।

১১ ও ১২ তারিখ কঙ্কর মারার সময় শুরু হবে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর। কারণ, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে আছে। তিনি বলেন,

«كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا»

"আমরা সময় দেখতে থাকতাম, যখন সূর্য ঢলে যেত তখন আমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করতাম"।[76]

যুলহাজ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবার সাথে সাথে আইয়্যামুত তাশরীকের কঙ্কর মারার সময় শেষ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যুলহাজ্জ মাসের তের তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে কঙ্কর মারতে পারলো না এর পর সে আর কঙ্কর মারবে না। তার ওপর দাম-ফিদয়া অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব আইয়্যামে তাশরীকের যুলহাজ মাসের এগার ও বার

[76] হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তারিখের রাত্রিগুলো মিনায় যাপন করবে আর যে হাজী সাহেবের বার তারিখের সূর্য ডুবে গেল অথচ সে মিনা থেকে বের হতে পারলো না তার ওপর মিনায় রাত্রি যাপন এবং তের তারিখের কঙ্কর মারা অপরিহার্য হবে।

হাজী সাহেব যদি মক্কা থেকে চলে যেতে চান তাহলে তাওয়াফে বি‘দা করে চলে যাবেন। কারণ, তা অধিকাংশ ফকীহের নিকট হজের ওয়াজিবসমূহের একটি ওয়াজিব। তবে তা ঋতুবর্তী মহিলা থেকে বাদ পড়ে যাবে। (অর্থাৎ তাকে তা করতে হবে না) কারণ, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا ينفرّنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي رواية: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض».

“কেউই (মক্কা হতে) চলে যাবে না যতক্ষণ না তার সর্বশেষ সময়টুকু আল্লাহর ঘরের কাছে কাটবে। (অর্থাৎ বিদায় তাওয়াফ না করে কেউই মক্কা ত্যাগ করবে না) অন্য বর্ণনায় আছে: ঋতুবর্তী মহিলার জন্য তাওয়াফে বিদা‘ না করেই চলে যাওয়া অনুমতি রয়েছে”।[77]

যে ব্যক্তি তাওয়াফে ইফাদাহ তার ভ্রমণ কাল পর্যন্ত পিছাবে তার জন্য তাওয়াফে ইফাদাই তাওয়াফে বিদা‘ হিসাবে অধিকাংশ ফকীহগণের নিকট যথেষ্ট হবে।

যে দো‘আটি বুখারী ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন সেই দো‘আটি হজ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তির জন্য পড়া

[77] হাদীসটি মালেক বর্ণনা করেছেন। আর মূল হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে।

মুস্তাহাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ থেকে বা হজ অথবা উমরা থেকে ফিরতেন তখন প্রত্যেক উঁচু জায়গায় "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর নিম্নের দো'আটি পড়তেন:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده».

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মূল্কু ওয়ালাহুল্ হামদু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইয়ীন ক্বাদীর। আ-য়েবূনা তায়েবূনা আ'বেদূনা লিরাব্বেনা হা-মেদূন, সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

সমাপ্ত

ইতিহাস কাণ্ডের এক মৌল মেরুদণ্ডের নাম ইসলাম। ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায় ও পর্যায় পেরিয়ে ইসলাম আজ এ

পর্যায়ে আসীন। তাকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, নির্ণয় করতে হবে তার মৌলিকত্ব, বিধিবিধান, বিশ্বাস, আচরণকে। বইটি তারই সংক্ষিপ্ত অর্থময় ও খুবই প্রাঞ্জল প্রয়াস।